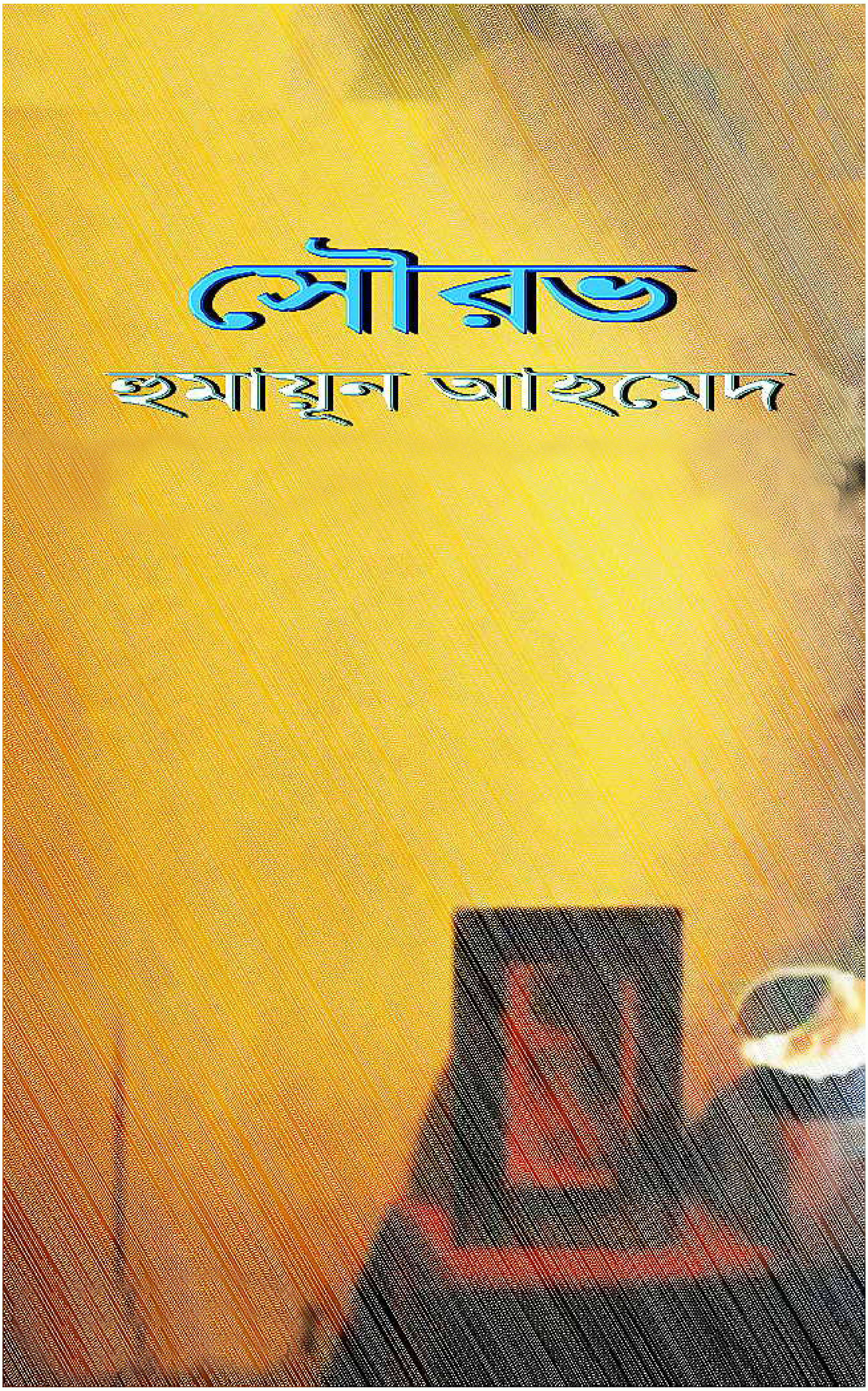
সৌরভ
হুমায়ূন আহমেদ

সৌরভ

১

আমাদের বাড়িতে ইদানীং ভূতের উপদ্রব হয়েছে।

নিচতলার ভাড়াটে নেজাম সাহেবের মতে একটি অল্পবয়েসী মেয়ের ছায়া নাকি ঘুরে বেড়ায়। গভীর রাতে উঁ উঁ করে কাঁদে। রাতবিরাতে সাদা কাপড় পরে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

নেজাম সাহেব লোকটি মহা চালবাজ। ছোট ছোট ধূর্ত চোখ। মাথা নিচু করে এমনভাবে হাঁটেন যে দেখলেই মনে হয় কিছু একটা মতলব আছে। এই লোকের কথা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ নেই, তবু আমি তাঁকে ডেকে পাঠালাম। গলার স্বর যতদূর সম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'কী সব আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছেন?'

নেজাম সাহেব এমন ভাব করলেন, যেন আমি একটি দারুণ অন্যায় কথা বলে ফেলেছি। মুখ কালো করে বললেন, 'আজেবাজে কথা ছড়াচ্ছি? আমি? বলেন কি ভাই সাহেব?'

'ভূত-প্রেতের কথা বলে বেড়াচ্ছেন লোকজনদের, বলছেন না?'

'ভূত-প্রেতের কথা তো বলি নাই। বলেছি একটি মেয়ের ছায়া আছে এই বাড়িতে।'

'ছায়া আছে মানে?'

'বাড়ির মধ্যে আপনার, ভাই, দোষ আছে।'

বলতে বলতে নেজাম সাহেব এমন একটি ভঙ্গি করলেন, যেন চোখের সামনে ছায়াময়ী মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছেন।

'বাড়ি-বন্ধনের ব্যবস্থা করা দরকার। বুঝলেন ভাই!

আমি কঠিন স্বরে বললাম, 'যা বলেছেন, বলেছেন। আর বলবেন না।'

নেজাম সাহেবকে বিদায় করে ঘরে এসে বসতেই আমার নিজের খানিকটা ভয়-ভয় করতে লাগল। রান্নাঘরে কিসের যেন খটখট শব্দ হচ্ছে। বাথরুমের কলটি কি খোলা ছিল? সরসর করে পানি পড়ছে। রান্নাঘরে কেউ যেন হাঁটছে। কাদের কি ফিরে এসেছে নাকি? আমি উঁচু গলায় ডাকলাম, 'এই কাদের। এই কাদের মিয়া।'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সাড়া পাওয়ার কথাও নয়। কাদের গিয়েছে সিগারেট আনতে। রাস্তার ওপাশেই পান-বিড়ির দোকান, তবু তার ঘন্টাখানিক লাগবে ফিরতে।

রান্নাঘরে আবার কী যেন একটি শব্দ হল। তার পরপরই কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিক হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে গেল। আমি বারান্দায় এসে দেখি ফকফকা জোৎস্না উঠেছে। নিচতলার নীলু বিলু দু'বোন ঘরের বাইরে মোড়া পেতে বসে আছে। নেজাম সাহেব উঠোনে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করে কী যেন বলছেন তাদের। আমাকে দেখে কথাবার্তা থেমে গেল। নেজাম সাহেব তরল গলায় বললেন, 'কেমন চাঁদনি দেখছেন ভাই? এর নাম সর্বনাশা চাঁদনি।'

আমি জবাব দিলাম না। এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। নেজাম সাহেব গুনগুন করে বিলুকে কী যেন বললেন। বিলু হেসে উঠল খিলখিল করে। এ রকম জ্যোৎস্নায় ভরা-বয়সের মেয়েদের খিলখিল হাসি শুনলে গা ঝিমঝিম করে। আমি নিজের ঘরে ফিরে কাদেরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রান্নাঘর থেকে আবার খটখট শব্দ উঠল। বিলু নীলু দু' জনেই আবার শব্দ করে হেসে উঠল। আমি ধরা গলায় ডাকলাম, 'কাদের, কাদের মিয়া।'

কাদের ফিরল রাত দশটায়, এবং এমন ভাব করতে লাগল যেন এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দু' ঘন্টা লাগাটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে গম্ভীর হয়ে হারিকেন ধরাল। তার চেয়েও গম্ভীর হয়ে বলল, 'অবস্থাডা খুব খারাপ ছোড ভাই।'

আমি চুপ করে রইলাম। কথাবার্তা শুরু করলেই আমার রাগ পড়ে যাবে। সেটা হতে দেওয়া যায় না।

'ছোড ভাই, দিন খারাপ।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'ভাত দে, কাদের।'

'আর ভাত। ভাত খাওনের দিন শেষ ছোড ভাই। মিত্যু সন্নিকট।' যে-কোনো গুরুগম্ভীর আলোচনায় কাদের মিয়া সাধু ভাষা ব্যবহার করে। এই অভ্যাস আগে ছিল না। নতুন হয়েছে।

'সর্বমোট তের লাখ ছয়চল্লিশ হাজার পাঁচ শ' পাঞ্জাবী এখন ঢাকা শহরে বর্তমান। আরো আসতাছে।'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, খাওয়াদাওয়ার পর কাদেরকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলব, ভবিষ্যতে সে যদি ফিরতে পাঁচ মিনিটের জায়গায় দু' ঘন্টা দেরি করে, তাহলে তার আর ঘরে ফেরার প্রয়োজন নেই।

বিসমিল্লাহ্ বিদায়।

ভাত খাওয়ার সময় কাদের মিয়া আবার তার পাঞ্জাবী মিলিটারির গল্প ফাঁদতে চেষ্টা করল।

'বাচ্চু ভাই দরবেশ কইছে এই দফায় বাঙ্গালির কাম শেষ।'

আমি জবাব দিলাম না। কাদেরের অভ্যাস হচ্ছে, যে-সব বিষয় আমি পছন্দ করি না, খাওয়ার সময় সেইসব বিষয়ের অবতারণা করা। গতরাত্রে খাওয়ার সময় সে তার মামাত ভাইয়ের গল্প শুরু করল। সেই মামাত ভাইটিকে কে যেন খুন করে একটা গাবগাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। পনের দিন পর সেই লাশ আবিষ্কার হল। আমি যখন ভাতের সঙ্গে ডাল মাখছি, তখন কাদের মিয়া সেই পচাগলা লাশের একটি বীভৎস প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়ে ফেলল। খাওয়া বন্ধ করে বাথরুমে গিয়ে বমি করতে হল আমাকে। আজকেও যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয়, সে-জন্যে আমি কথা বলার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বললাম, 'বাচ্চু ভাই দরবেশটা কে?'

'চায়ের দোকান আছে একটা। সুফি মানুষ। তাঁর এক চাচা হইলেন হয়রত ফজলুল করিম নকশবন্দি।'

'নকশবন্দি জিনিসটা কি?'

'পীর ফকিরের নামের মইধ্যে থাকে ছোড ভাই।'

'নকশবন্দির ভাতিজার কাছে ভবিষ্যতে আর যেন না যাওয়া হয়।' কাদের মিয়া উত্তর দিল না। আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'এই সব লোকজন আমি মোটেই পছন্দ করি না'

'দরবেশ বাচ্চু ভাই এক জন বিশিষ্ট পীর।'

'পীর মানুষ চায়ের দোকান দিয়ে বসে আছে, এটা কেমন কথা?'

'আমাদের নবী-এ করিম রসুলাল্লাহ্ নিজেও তো ব্যবসাপাতি করতেন ছোড ভাই।'

আমি সরু চোখে তাকালাম কাদেরের দিকে। মুখে মুখে কথা বলার এই অভ্যাসও কাদেরের নতুন হয়েছে। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে কাদের।'

কাদের সঙ্গে আমি তুই-তুই করে বলি। কোনো কারণে বিশেষ রেগে গেলেই শুধু তুমি সম্বোধন করি। কাদের তখন দারুণ নার্ভাস বোধ করে।

'কী কথা ছোড ভাই?'

কী কথা বলবার আগেই নিচতলার তিন নম্বর ঘর থেকে কান্নার শব্দ শোনা যেতে লাগল। আজ এক মাস ধরে এই বাড়ির মেয়েটি কাঁদছে। এপ্রিল মাসের তিন তারিখ জলিল সাহেব বাড়ি ফেরেন নি। তাঁর স্ত্রী হয়তো রোজ আশা করে থাকে আজ ফিরবে। রাত এগারটা থেকে কার্ফিউ। এগারটা বেজে গেলে আর ফেরবার আশা থাকে না। মেয়েটি তখন কাঁদতে শুরু করে। মানুষের শোকের প্রকাশ এত

শব্দময় কেন? যে-মেয়েটির কোনো কথা কোনো দিন শুনি নি, গভীর রাতে তার কান্না শুনতে এমন অদ্ভুত লাগে।

'ছোড ভাই, জলিল সাবের এক ভাই আসছে আইজ।'

'তবে যে শুনলাম জলিল সাহেবের কোনো ভাই নেই।'

'চাচাত ভাই। মৌলানা মানুষ। বউ আর পুলাপানটিরে নিতে আইছে।'

'কবে নেবে?'

'বউটা যাইতে চায় না।'

কেন যেতে চায় না?'

'কি জানি। মাইয়া মাইনসের কি বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে?

আমি চুপ করে রইলাম। কাদের মিয়া বলল, 'সময়ডা খুব খারাপ। কেয়ামত নজদিক।'

ঘুমুতে গেলাম অনেক রাতে। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে কোথায়ও গুলীর শব্দ শোনা গেল। গুলীর শব্দ দিয়ে এখন আর ভয় দেখানর প্রয়োজন নেই। তবু ওরা কেন রোজ গুলী ছোঁড়ে কে জানে!

কাদের আমার পাশের ঘরে শোয়। তার খুব সজাগ নিদ্রা। সামান্য খটখট শব্দেও জেগে উঠে বিকট হাঁক দেয়--'কেডা, কেডা শব্দ করে?'

আজকেও গুলীর শব্দে জেগে উঠল। ভীত স্বরে বলল, 'শুনতাছেন ছোড ভাই? কাম সাফ।'

আমি জবাব দিলাম না। আমার সাড়া পেলেই ব্যাটা উঠে এসে এমন সব গল্প ফাঁদবে যে ঘুমের দফা সারা।

'ছোড ভাই ঘুমাইছেন?'

আমি গাঢ় ঘুমের ভান করলাম। লম্বা নিঃশ্বাস ফেললাম।

'ছোড ভাই, ও ছোড ভাই।'

'কি?'

'মিত্যু সন্নিকট ছোড ভাই।'

'ঘুমা কাদের। বকবক করিস না।'

'আর ঘুম! বাঁচলে তো ঘুম। জীবনই নাই।'

'ঝামেলা করিস না কাদের, ঘুমা।'

কাদের ঘুমায় না। বিড়ি ধরায়। বিড়ির কড়া গন্ধে বমি আসার যোগাড় হয়। চারদিক নীরব হয়ে যায়। জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্নাও আর শোনা যায় না। কিছুতেই ঘুম আসে না আমার। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করি। এক বার বাথরুমে গিয়ে মাথা ধুয়ে এলাম। মাথার নিচে তিনটি বালিশ দিয়ে উঁচু করলাম। আবার বালিশ ছাড়া ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হয় না। এক সময় কাদের মিয়া বলল, 'ঘুম আসে না ছোড ভাই?'

'না।'

'আমারো না। বড়ো ভয় লাগে।'

'ভয়ের কিছু নাই কাদের।'

'তা ঠিক। মৃত্যু হইল গিয়া কপালের লিখন। না যায় খণ্ডন।'

কাদেরের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মিল আছে। সে আমার মতোই ভীরু এবং আমার মতো তারও কঠিন অনিদ্রা রোগ।

সাড়ে তিনটার দিকে ঘুমের আশা বাদ দিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। কাদের মিয়া চায়ের জন্য কেরোসিনের চুলা ধরাল। চুলাটাও সে নিয়ে এসেছে বারান্দায়। আমার দিকে পিঠ দিয়ে আবার বিড়ি ধরিয়েছে।

নিচতলায়ও কে এক জন যেন সিগারেট ধরিয়েছে, বসে আছে জামগাছের নিচে--অন্ধকারে।

'গাছ তলায় ওটা কে বসে আছে, কাদের?'

কাদের কিছু না দেখেই বলল, 'নেজাম সাহেব।'

'বুঝলে কী করে নেজাম সাহেব?'

'নেজাম সাহেবেরও রাইতে ঘুম হয় না।'

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরে গেল। ঝিমুনির মধ্যে মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ভোরবেলা এক জন ডাক্তারের কাছে যাব। রাতের পর রাত না ঘুমানটা ভালো কথা নয়। বড়ো আপার বাসায়ও যেতে হবে। বড়ো আপা এর মধ্যে তিন বার খবর পাঠিয়েছে। জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। তারাও যদি সত্যি সত্যি চলে যায়, তাহলে ভাড়াটে দেখা দরকার। ভাড়াটে পাওয়া যাবে না, বলাই বাহুল্য। শহর ছেড়ে সবাই এখন যাচ্ছে গ্রামে। কিন্তু বড়ো আপা এই সব শুনবে না। তাঁর ধারণা--ঢাকা শহরের চার ভাগের এক ভাগ লোক থাকার জায়গা পাচ্ছে না। রাত দিন 'টু লেট' খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চা হয়েছে চমৎকার। চুমুক দিয়ে বেশ লাগল। চারদিকে সুনসান নীরবতা। চাঁদের ম্লান আলো। শীত শীত হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে দূরে কোথায়। মনটা হঠাৎ দারুণ খারাপ হয়ে গেল।

২

সকালবেলা নিচে নামতেই আজিজ সাহেবের সঙ্গে দেখা।

আজিজ সাহেব বিলু নীলুর বাবা। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। চেখেও দেখতে পান না। পায়ের শব্দে মানুষ চিনতে পারেন। আমি পা ঘষটে ঘষটে বাড়ি ঢুকলেও তিনি চিকন সুরে ডাকবেন--'কে যায়? শফিক না?'

আজিজ সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া একট দুর্ঘটনা বিশেষ। দেখা হওয়ামাত্র তিনি বাড়ির কোনো একটি সমস্যার কথা তুলবেন--

'কল দিয়ে পানি লিক করছে।'

'বসার ঘরে সুইচটা নষ্ট, হাত দিলেই শক করে।'

'শোবার ঘরের একট জানালার পুডিং উঠে গেছে, যে-কোনো সময় কাঁচ খুলে পড়বে।'

যে-লোক চোখে দেখে না এবং সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে, সে এত সব লক্ষ করে কী করে, সে এক রহস্য। বাড়ির প্রসঙ্গ শেষ হওয়ামাত্র তিনি রাজনীতি নিয়ে আসেন। তাঁর রাজনীতিরও কোনো আগামাথা নেই। একেক দিন একেক কথা বলেন। রাজনীতির পরে আসে স্বাস্থ্যবিধি। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাধির কোনো-না-কোনো টোটকা তাঁর জানা আছে। জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র অষুধ যে রসুনের খোসা, সেটি তাঁর কাছ থেকেই আমার শোনা।

সকালবেলা তাঁকে ধরাধরি করে বারান্দার ইজিচেয়ারে শুইয়ে দেওয়া হয়। দুপুর পর্যন্ত অনবরত ভ্যাজর ভ্যাজর করতে থাকেন। তিনি বারান্দায় থাকলে আমি পারতপক্ষে নিচে নামি না। আজকেও তিনি বারান্দায় ছিলেন না। পায়ের শব্দ শুনে শোবার ঘর থেকে ডাক দিয়েছেন 'কে, শফিক না? আস তো দেখি এদিকে। বাথরুমের ফ্লাশটা থেকে ঘসর ঘসর শব্দ হয়। পানির কোনো ফ্লো নাই।'

'আমি কাদেরকে বলব আজিজ সাহেব। সে মিস্ত্রী নিয়ে আসবে।'

'আস তো ভেতরে, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'আমার একটা জরুরী কাজ আছে, আজিজ সাহেব।'

'এক মিনিট বসে যাও। ও নীলু, চা দে তো।'

'আজিজ সাহেব, আমার এখন না গেলেই না।'

'চা খেতে আর কয় মিনিট লাগে? নীলু, তাড়াতাড়ি চা দে।'

বাধ্য হয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। আজিজ সাহেব ঘরে ঢোকামাত্র গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'কালকে রাতে কিছু শুনলে?'

'গুলীর কথা বলছেন?'

'আহ্, আস্তে বল। চারদিকে স্পাই। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছ?'

'কিসের কথা বলছেন?'

'আরে মিলিটারি তো সব কচুকাটা হয়ে গেল। আছ কোথায় তুমি?'

'তাই নাকি?'

'ভিক্ষা চাই না, মা, কুত্তা সামলা অবস্থা এখন। হা হা হা। মিলিটারিরা আর বড়ো জোর এক মাস আছে। বিশ্বেস না হয় লিখে রাখ। গুণে-গেঁথে ত্রিশ দিন।'

গণ্ডগোলের দিন থেকেই তিনি মিলিটারিকে হয় এক মাস নয়-পনের দিন সময় দিচ্ছেন। তাঁর হিসাবে রোজ দু' থেকে তিন হাজার মিলিটারি খতম হয়ে

যাচ্ছে। চিটাগাং এবং কুমিল্লা--এই দুই জায়গা থেকে টাইট দেওয়া হচ্ছে।

'জিয়া সাহেব কি সহজ লোক? বাঘের মামা টাগ। পাঞ্জাবী সব কাঁচা খেয়ে ফেলবে না? তুমি ভাবছ কী?'

আজিজ সাহেব এমন মুখভঙ্গি করলেন, যেন পাঞ্জাবী মিলিটারিদের আমি লেলিয়ে দিয়েছি। আমি বিরস মুখে বললাম, 'আজিজ সাহেব, আজ উঠতে হয়। চা আজকে আর খাব না।'

'আহ্, বস দেখি। এই নীলু, চা হয়েছে?'

নীলু সাড়াশব্দও করল না, চা নিয়েও এল না। আজিজ সাহেব শুরু করলেন যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি। ওদের ভুল থেকে আমাদের কী কী শেখা উচিত ছিল, এবং না শেখাতে আমাদের কী হয়েছে এই সব। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। প্রায় আধ ঘন্টা পর নীলু এসে বলল, 'চা দেরি হবে। চিনি নেই। আনতে গেছে।' তাকিয়ে দেখি, নীলু মুখ টিপে হাসছে। চোখে চোখ পড়ামাত্র অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বলল, 'সত্যি চিনি নেই। বিশ্বেস করুন।'

ছাড়া পেলাম এগারটায়। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তখন। এই সময় মগবাজারে বড়ো আপার বাসায় যাবার কোনো অর্থ হয় না। প্রথমত, দুলাভাই বাসায় থাকবেন না। দ্বিতীয়ত, বৃষ্টিতে ভিজলে আমার টনসিল ফুলে ওঠে। সবচেয়ে ভালো হয় রফিকের বাসায় গিয়ে টেলিফোন করলে। কিন্তু তারও সমস্যা আছে। টেলিফোন রফিকদের শোবার ঘরে। টেলিফোন করতে গেলেই বাড়ির মেয়েরা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনতে চেষ্টা করে, কী কথাবার্তা হচ্ছে। এবং টেলিফোনের শেষে রফিকের মা প্রচুর চিনি দিয়ে হিমশীতল এক কাপ চা খেতে দেন। সেই চায়ে দুধের সর এবং কালো রঙের পিঁপড়ে ভাসতে থাকে।

'শফিক সাহেব, আপনার সঙ্গে একটা কথা।'

লোকটিকে চিনতে পারলাম না। লম্বা দাড়ি। হালকা নীল রঙের একটা লম্বা পাঞ্জাবি--ঝুল নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। গা থেকে আতরের গন্ধ আসছে।

'আমি আব্দুল জলিলের বড়ো ভাই।'

'ও আচ্ছা। কেমন আছেন?'

'আলহামদুলিল্লাহ্, ভালো আছি। জলিলের বৌ আর বাচ্চাটারে নিতে আসছি। আমি থাকি চাঁদপুরে। মাষ্টারী করি।'

'কিছু বলতে চান আমাকে?'

'জ্বি।'

'বলুন।'

'জনাব, আমি শুনলাম আপনি জলিলের খোঁজখবর করতেছেন।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বলে কি এই লোক। আমি খোঁজ করব কি? আর খুঁজবই-বা কোথায়?

'আপনার অনেক জানাশোনা আছে। একটু যদি দয়া করেন।'

ভদ্রলোক চোখ মুছতে লাগলেন। এক জন বয়স্ক লোকের কান্নার মতো কুৎসিত আর কিছুই নেই। আমি ধমক দিয়ে কান্না থামাতে চাইলাম, 'কাঁদবেন না।'

'ঢাকা শহরে আমার চেনা-জানা কেউ নাই শফিক সাব।'

'দিন কাল খুব খারাপ এখন। চেনাজানাতে কাজ হয় না।'

'তা ঠিক ভাই। খুব ঠিক। কী করব বলেন, মনটা পেরেশান।'

'মন পেরেশান করে তো লাভ নেই। মন শক্ত করেন।'

'চেষ্টা করি, খুব চেষ্টা করি। বিনা দোষে জেলখানাতে আছে মনে হইলেই মন কান্দে।'

'জেলখানাতে আছে, বলল কে?'

'আপনার সাথে যে ছেলেটা থাকে, কাদের মিয়া--সে বলল। অতি ভালো ছেলে। বিশিষ্ট ভদ্রঘরের সন্তান। দুই-তিন বার খোঁজখবর নেয়। গতকাল এক দরবেশ সাহেবের তাবিজ এনে দিয়েছে। দরবেশ বাচ্চু ভাই। খুব বড়ো আলেম। নাম শুনেছেন বোধ হয়।

'আমি সাধ্যমত খোঁজখবর নেব। তবে সময়টা খারাপ, ইচ্ছা থাকলেও কিছু করা যায় না। ও কি, আবার কাঁদেন কেন?'

'আল্লাহ্ পাক আপনার ভালো করবেন, শফিক ভাই।'

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। রাস্তায় নেমে দু'টি জিনিস ঠিক করে ফেললাম। রফিকের বাসায় গিয়েই টেলিফোন করব, আর রফিককে জিজ্ঞেস করব লোকজন হারিয়ে গেলে কোথায় খোঁজ করতে হয়। রফিক অনেক খবরাখবর রাখে। সে কিছু একটা করবেই।

রফিক বাসায় ছিল না। তার ছোট ভাই গম্ভীর হয়ে বলল, 'টেলিফোন করতে এসেছেন? আমাদের টেলিফোন নষ্ট।'

রফিকের এই ভাইটিকে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। সব সময় চালিয়াতি ধরনের কথাবার্তা বলে।

'আপনি কি বসবেন? দাদা ঘন্টাখানিকের মধ্যে ফিরবে।'

'তাহলে বসব। ওর সঙ্গে দরকার আছে আমার।'

বসার ঘরের দরজা খুলে সে আমাকে নিয়ে বসাল। 'কালকে রাত্রে আপনি কি গুলীর শব্দ শুনেছেন?' আমি অম্লান বদনে মিথ্যা বললাম, 'না। কাল খুব ভালো ঘুম হয়েছে, কিছু টের পাই নি।'

'কালকে ভীষণ গুলী হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কী জন্যে হয়েছে জানেন?'

'না, আমি কী করে জানব?'

সে এমন ভাবে তাকাল, যেন আমি একটি গরুবিশেষ।

'আপনার কি কোনো কিছুই জানতে ইচ্ছা করে না?'

'না, তেমন করে না।'

'ও আচ্ছা।'

ঘন্টাখানিক বসে থেকেও রফিকের খোঁজ পাওয়া গেল না। সরভাসা চা খেলাম পরপর দু' কাপ। রফিকের মা-ও যথারীতি এক ফাঁকে এসে আহাজারি করে গেলেন।

'রফিকটার পড়াশোনা হয় নাই কুসঙ্গে থাকার জন্য। যত ছোটলোকের সাথে তার খাতির। তুমি আবার কিছু মনে করো না বাবা। তোমাকে কিছু বলছি না।'

'না খালা, মনে করার কী আছে।'

'আমি আবার মনের মধ্যে যা আসে বলে ফেলি।'

'এইটাই ভালো। বলে ফেলাই ভালো।'

ঘর থেকে বের হয়ে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত এসে দেখি রফিক আসছে হনহন করে। তার দু' হাতে দু'টি প্রকাণ্ড বাজারের ব্যাগ। নিখোঁজ লোকদের কোথায় খুঁজতে হবে জিজ্ঞেস করা মাত্রই সে বলল, 'লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে থাক। আমি ব্যাগ দু'টি রেখে আসছি।'

আমরা গেলাম জনাব ইজাবুদ্দিন সাহেবের বাড়ি। ইজাবুদ্দিন সাহেব শান্তি কমিটির এক জন মেম্বার। হলুদ রঙের একটা দোতলা বাড়িতে থাকেন। বাড়ির নাম ভাই ভাই কুটির। নেমপ্লেটে লেখা এম. এ. (গোল্ড মেডালিস্ট) এল-এল. বি.। রফিক বলল, 'লোকটার সবচেয়ে বড়ো গুণ হল--বিরক্ত হয় না। সব সময় হাসিমুখ।'

কথা খুবই ঠিক। ইজাবুদ্দিন সাহেব মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। খাতা বের করে নাম-ধাম লিখে রাখলেন এবং বললেন, মিলিটারি জেলে আছে কিনা সে-খবর তিনি দু' দিনের মধ্যে এনে দেবেন। যখন বেরিয়ে আসছি, তখন ইজাবুদ্দিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'আপনার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন তিনি। তাঁর বড়ো মেয়ের বিয়েতে আমি উপস্থিত ছিলাম। খাওয়াদাওয়া নিয়ে দারুন ঝামেলা হয়েছিল।'

আমি বললাম, 'আমি এসে খোঁজ নিয়ে যাব।'

'না না, আপনার আসতে হবে না, আমি খবর দেব। বাড়ি আমি চিনি, কত বার গিয়েছি। শরিফ আদমী ছিলেন আপনার বাবা।'

রফিককে ছেড়ে দিয়ে নিউমার্কেট পর্যন্ত চলে এলাম। হাঁটা আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর। কিন্তু কোনো একটি বিচিত্র কারণে রিকশায় উঠলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস নিতে পারি না।

নিউ মার্কেটের সামনে একটি প্রকাণ্ড মিলিটারি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। তিন–চার জন কালো পোশাক পরা মিলিটারি (নাকি মিলিশিয়া? কে যেন বলেছিল কালো পোশাকেরগুলি মিলিশিয়া––আরো ভয়ঙ্কর) জটলা পাকাচ্ছিল। সবার চেহারা দেখতে এক রকম। এক জন একটু দূরে দাঁড়িয়ে লম্বা একটা চুরুট টানছে। এর চেহারা অদ্ভুত সুন্দর। পাতলা পাতলা ঠোঁট, টানা চোখ, রাজপুত্রের মতো চেহারা।

এরা দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেই এই দিক দিয়ে লোক চলাচল একেবারেই নেই। এক জন বুড়ো মতো মানুষ শুধু একটি ওজনের যন্ত্র নিয়ে শুকনো মুখে বসেছিল। দু'টি মিলিটারি ওকে কী সব জিজ্ঞেস করে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। এক জন আবার দেখি, ওজনের যন্ত্রটায় উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি বিনা দ্বিধায় ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। মিলিটারি আমাকে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে না। আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চায় না। ছাত্র না চাকরি করি, তাও জানতে চায় না। কারণ আমার ডান পাটি বাঁকা। আমি ডান দিকে ঝুঁকে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাঁটি। লাঠি দিয়ে শরীরের ভার অনেকটা সামলাতে হয়। আমার দিকে ওদের কোনো আগ্রহ নেই।

শারীরিক অক্ষমতা যে এমন একটি সুখকর ব্যাপার হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমাকে দেখে রাজপুত্রের মতো সেই মিলিটারিটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'ভালো আছেন?'

ওজন–মাপা লোকটি অবাক হয়ে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি হাসিমুখে রাজপুত্রটিকে বললাম, 'আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন তো ভাই?'

৩

বড়ো আপা আমাকে দেখেই বলল, 'তোর কথাই ভাবছিলাম।'

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যা। কারো সঙ্গে দেখা হলেই সে এ–রকম বলে। তার ধারণা, এ ধরনের কথাবার্তায় খুব আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। তার আন্তরিকতা প্রকাশের আরেকটি কায়দা হচ্ছে ভাত খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করা। বিকাল চারটার সময় গেলেও সে গলা সরু করে বলবে, 'আজরফ মিয়া, টেবিলে ভাত দাও তো। তরকারি গরম কর। লেবু কাট। আর দেখ কাঁচামরিচ আছে কিনা।'

আজকে অবশ্যি সে–রকম হল না। সে দেখলাম গম্ভীর হয়ে আছে। চোখ–মুখ ফোলা–ফোলা। বলাই বাহুল্য, দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি সহজ ভাবে বললাম, 'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার–ট্যাপার কিছু না।'

'ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

'নাহ্।'

'তুমি গম্ভীর হয়ে আছ।'

'শীলার জ্বর। তোর দুলাভাইকে বললাম ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। সে নেবে না। তার ধারণা, একটু গা গরম হলেই ডাক্তারের কাছে দৌড় দেওয়ার কোনো দরকার নেই।'

'জ্বর কি খুব বেশি?'

'সকালবেলা ১০২ পয়েন্ট পাঁচ ছিল। এখন ৯৯।'

'ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিয়েই কি ঝগড়া?'

'বললাম তো ঝগড়া কিছুই হয় নি। এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করিস।'

বড়ো আপা কাঁদতে শুরু করল। কান্না তার একটি রোগবিশেষ। যে-কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে কেঁদে বুক ভাসাতে পারে। আমরা তার কান্নায় কখনো কোনো গুরুত্ব দিই না।

'আপা কাঁদছ কেন?'

'তোর দুলাভাই আমাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। শহরের অবস্থা নাকি খুব খারাপ।'

'তোমার কাছে খারাপ মনে হচ্ছে না?'

'মনে হবে না কেন? তবে তোর আমার জন্যে তো কিছু না। আমরা হিন্দুও না, আমরা আওয়ামী লীগও করি না। আমাদের আবার কিসের অসুবিধা?'

আমি চুপ করে রইলাম। বড়ো আপা থেমে থেমে বলতে লাগল, 'অবস্থা তো অনেক ভালো হয়েছে এখন। পরশু দিন আমি একা একা নিউমার্কেট থেকে বাজার করে আনলাম। আগে কার্ফু ছিল নয়টা থেকে, এখন দশটা থেকে। ঠিক না? তুই বল?'

'তা ঠিক।'

'তোর দুলাভাইয়ের ধারণা, গ্রামে গেলে আর কোনো ভয় নেই। এইখানে ভয়টা কিসের? পত্রিকায় দিয়েছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স পরীক্ষার ডেট দিয়েছে। অবস্থা খারাপ হলে দিত?'

'পরীক্ষার ডেট দিয়েছে নাকি?'

'হুঁ, দৈনিক পাকিস্তানে আছে। দাঁড়া, নিয়ে আসছি, নিজের চোখে দেখ।'

'থাক আপা, আনতে হবে না।'

'না, তুই দেখে যা।'

সারাটা দিন বড়ো আপার বাসায় কাটাতে হল। দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা না করে আসা ভালো দেখায় না। তিনি ফিরবেন ছ'টার দিকে। এত দীর্ঘ সময় বড়ো আপার সঙ্গে কাটান একটি ক্লান্তিকর ব্যাপার। এক গল্পই তার কাছে অনেক বার শুনতে হয়। আজরফ কী করে কাপড়-ধোওয়া সাবান দিয়ে ধুয়ে তার একটি বেনারসী শাড়ি নষ্ট করেছে, সে-গল্প আমাকে চতুর্থ বারের মতো শুনতে হল।

তারপর শুরু করল দুলাভাইয়ের এক বোনের গল্প। সেই বোনটি বিয়ের পর তার স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে কী সব নটঘট করতে শুরু করেছে। এই গল্পটিও আগে শোনা।

আমি হাই তুলে বললাম, 'শীলা কোথায় আপা?'

'ওর বান্ধবী এসেছে।'

'যাই, দেখা দিয়ে আসি।'

'দরজা বন্ধ করে রেখেছে ওরা।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ।'

দরজা বন্ধ করার ব্যাপার নিয়েও বড়ো আপা গজগজ করতে লাগলেন।

'দরজা বন্ধ করে কথা বলার দরকারটা কী? এই সব আমি পছন্দ করি না। মেয়েরা দরজা বন্ধ করলেই তাদের মাথায় আজেবাজে সব খেয়াল আসে।'

শীলার বয়স এমন কিছু নয়। তের হয়েছে। বড়ো আপা বলেন সাড়ে এগার। অবশ্যি শীলাকে বেশ বড়োসড়ো দেখায়। এই তের বছর বয়সেই সে গোটা চারেক প্রেমপত্র পেয়েছে। এর মধ্যে একটি সে আমাকে দেখিয়েছে (আমার সঙ্গে তার বেশ ভাব আছে)। সেই চিঠিটি এতই কুৎসিত যে পড়া শেষ করে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। আমি যখন বললাম, 'এই চিঠি তুই জমা করে রেখেছিস? ছিঁড়ে ফেলে দিস না কেন?'

শীলা অবাক হয়ে বলেছে, 'আমার কাছে লেখা চিঠি আমি ফেলব কেন? জানো, লুনা একুশটা চিঠি পেয়েছে? এর মধ্যে একটা আছে ষোল পাতার।'

'কী আছে সেই ষোল পাতার চিঠিতে?'

'তোমাকে বলা যাবে না।'

লুনা মেয়েটিই আজকে এসেছে। বড়ো আপা একে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। প্রধান কারণ হচ্ছে, মেয়েটি অসামান্য রূপসী। আমার ধারণা, এই মেয়েটির দিকে তাকালে যে-কোনো পুরুষের মনে তীব্র ব্যথাবোধ হয়। বড়ো আপা মুখ লম্বা করে বললেন, 'লুনার সঙ্গে অল্পবয়েসী মেয়েদের মিশতে দেয়া উচিত না।'

আমি বলব না বলব না করেও বললাম, 'লুনাও তো অল্পবয়েসী।'

বড়ো আপা আকাশ থেকে পড়ল, 'অল্প বয়েস কোথায় দেখলি তুই! দুই বছর আগে থেকে ব্রা পরে এই মেয়ে।'

বিকালে চা দিতে এসে আজরফ গম্ভীর মুখে বলল, 'বড়ো রাস্তার মোড়ে একটা মিলিটারি জীপ।'

আপা এটা শুনেই রেগে গেল। 'মিলিটারি জীপ হয়েছে তো কী হয়েছে? মিলিটারি তোকে খেয়ে ফেলেছে? গরু কোথাকার! যা আমার সামনে থেকে।'

আজরফ সামনে থেকে নড়ল না। মুখ আগের চেয়েও গম্ভীর করে চা ঢালতে

লাগল। আপা থমথমে গলায় বলল, 'মিলিটারি জীপ দেখেছিস, দেখেছিস। এর মধ্যে গল্প করার কী আছে? খবরদার, এই সব নিয়ে গল্পগুজব করবি না। আমি পছন্দ করি না।'

'আম্মা জীপটার লক্ষণ বালা না। এক জায়গার মধ্যে ঘুরাঘুরি করতাছে।'

'করুক। তারা তাদের কাজ করবে, তুই করবি তোর।'

'আইচ্ছা।'

'খবরদার, মিলিটারি নিয়ে আর কোনো কথা বলবি না।'

'আইচ্ছা।'

আপার বক্তৃতা আজরফের মনে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। কারণ খানিকক্ষণ পর শীলা এসে বলল, 'আজরফ ভাই বলল রাস্তার মোড়ে একটা জীপ ঘোরাঘুরি করছে।'

'করুক, তাতে তোমার কী?'

'ওরা অল্পবয়সী মেয়েদের ধরে নিয়ে নেংটা করে একটা ঘরের মধ্যে রেখে দেয়।'

বড়ো আপা স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'কে বলেছে এই সব?'

'লুনা। লুনা বলল।'

'যাও, নিজের ঘরে যাও। যত আজগুবী কথাবার্তা। বলতে লজ্জাও করে না।'

'লজ্জা করবে কী জন্যে? আমাকে তো আর নেংটো করে রাখে নি।' শীলা ফিক করে হেসে ফেলল।

'যাও, ঘরে যাও। তোমার বন্ধু যাবে কখন?'

'ও আজ থাকবে আমার সঙ্গে। বাসায় টেলিফোন করে দিয়েছি। মা, তুমি কিন্তু খিচুড়ি করবে রাত্রে। আমর এখন জ্বর নেই।।

'ঠিক আছে, তুমি যাও। আজরফকে পাঠিয়ে দিও।'

আপা দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারল না। আজরফ যখন দ্বিতীয় বার চা দিতে এল তখন শুধু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আজরফ, তোমার চাকরি শেষ। কাল সকাল ন'টায় বেতনটেতন বুঝে নিয়ে বাড়ি যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা, আম্মা।'

আজরফকে মোটেই বিচলিত মনে হল না। দিনের মধ্যে কয়েক বার যার চাকরি চলে যায়, তাকে চাকরি নিয়ে বিচলিত হলে চলে না।

দুলাভাই ঠিক ছ'টার সময় এলেন।

'তাঁর সব কাজ ঘড়ি ধরা, সময় নিয়ে খানিকটা বাতিকের মতো আছে। পাঁচটায় কোথায়ও যাওয়ার কথা থাকলে চারটা পঞ্চাশে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং ঠিক পাঁচটায় ঢুকবেন। অফিসের লোকরা তাঁকে ঘড়িবাবু বলে।

দুলাভাই আমাকে দেখেই বললেন, 'তিন ঠ্যাং-এর শালা বাবু যে? কী হেতু আগমন?'

পা নিয়ে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু দুলাভাইয়ের উপর আমি কখনো রাগ করতে পারি না। এই লোকটিকে আমি খুবই পছন্দ করি।

'আছ কেমন শালা বাবু?'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'ভালো আছি দুলাভাই।'

'তোমার তিন নম্বর ঠ্যাংটা সাবধানে রাখছ তো? খানায় পড়ার সম্ভাবনা। হা-হা-হা।'

'সাবধানেই রাখছি।' আমাকেও হাসির ভান করতে হয়।

'শুনেছ নাকি, ওদের নীলগঞ্জে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'শুনেছি।'

'তোমার আপার ধারণা, সে বনবাসে যাচ্ছে। তবে যে-পরিমাণ কান্নাকাটি করছে, সীতাও তার বনবাসে এত কাঁদে নি।'

'সীতার সঙ্গে তো রাম ছিল। কিন্তু আপনি তো যাচ্ছেন না।'

'আমিও যাব। ব্যাক টু দা ফরেস্ট। তবে কিছুদিন পর। তুমিও চল।'

'না দুলাভাই। এখানে আমার কোনো অসুবিধা নেই।'

'তা ঠিক। ঢাকা শহরে কানা-খোঁড়া-অন্ধ এরা বর্তমানে খুব নিরাপদ। হা-হা-হা।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'রাগ করলে নাকি শফিক?'

'জ্বি-না।'

'ঠাট্টা করে বলি।'

'ঠিক আছে।'

বড়ো আপা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি আরেক বার?'

দুলাভাই বললেন, 'আমি খাব। আমাকে এক কাপ লেবু চা দাও।'

বড়ো আপা কথা না বলে চলে গেলেন। দুলাভাই ক্লান্ত স্বরে বললেন, ' তোমার এক জন ভাড়াটে যে নিখোঁজ হয়েছিল, কী নাম যেন তার?'

'আব্দুল জলিল।'

'ও হ্যাঁ, জলিল। কোনো খোঁজ হয়েছে?'

'এখনো হয় নি। রফিককে নিয়ে চেষ্টা করছি।'

'তুমি খোঁজাখুঁজির মধ্যে যাবে না। কোনো ক্রমেই না। সময় ভালো না এখন। প্রায়ই লোকজন ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'করছে কী ওদের?'

'কিছু দিন রেখে ছেড়ে দিচ্ছে সম্ভবত। মানুষ মারা তো খুব কঠিন ব্যাপার।'

'ধরাধরিটাই–বা করছে কি জন্যে?

'মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। ভয় ধরানর এটা খুব ইফেকটিভ ব্যবস্থা। এক জন নিখোঁজ হলে পাঁচ হাজার লোক সেটা জানে। সবাই খোঁজাখুঁজি করে।'

বড়ো আপা থমথমে মুখে চা নিয়ে ঢুকল। ওর বুদ্ধিসুদ্ধি সত্যি কম। চা এনেছে শুধু আমার জন্যে, দুলাভাইয়ের জন্যে নয়। তিনি একটু হাসলেন এবং হাসিমুখেই বললেন, 'শীলার জ্বর কমেছে? লুনাকে দেখলাম ওর ঘরে।'

আপা জবাব দিল না।

'ও কি আজকে থাকবে? এই সময় কেউ মেয়েদের বাইরে পাঠায়? কী আশ্চর্য!'

আপা তারও জবাব দিল না।

আমি বললাম, 'মেয়েটি আজকে থাকবে দুলাভাই। শীলা ওর বাসায় টেলিফোন করে দিয়েছে।'

'মেয়েটিকে তুমি দেখেছ শফিক?'

'দেখেছি।'

'ওর চেয়ে সুন্দর মেয়ে তুমি দেখেছ?'

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'না।'

আমি কিন্তু দেখেছি। ঢাকা কলেজে তখন পড়ি। বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে করে যাচ্ছি দিনাজপুরে। ময়মনসিংহ স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখি, একটি ষোল–সতের বছরের মেয়ে প্লাটফরমে টিনের একটা ট্রাঙ্কে বসে আছে। খুবই গরিব ঘরের মেয়ে। পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল।'

আপা রাগী গলায় বলে উঠলেন, 'লুনার মধ্যে তুমি সুন্দরের কী দেখলে? সমস্ত মুখ ভর্তি নাক।'

'লুনার কথা তো আমি বলছি না। যার কথা আমি বলছি, তার নামধাম কিছুই জানি না।'

আপা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দুলাভাই হাসতে লাগলেন ঘর ফাটিয়ে।

আমি বললাম, 'ওদের কবে পাঠাচ্ছেন?'

'এই মাসেই পাঠাব। আমি নিজেও চলে যেতে পারি। রাত্রে আমার ভালো ঘুম হয় না। আরাম করে ঘুমুতে ইচ্ছা করে।'

দুলাভাই গাড়ি করে আমাকে পৌঁছে দিতে রওনা হলেন। সাতটা মাত্র বাজে, এর মধ্যেই দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে লোক–চলাচল নেই। কেমন খাঁ–খাঁ করছে চারদিক। এত বড়ো একটা শহর ঝিম মেরে গিয়েছে।

দুলাভাই বললেন, 'সন্ধ্যার পর চলাফেরা করা ঠিক না।'

'দুলাভাই, আপনার কি ভয় লাগছে?'

'না, ভয় লাগে না। অন্য রকম লাগে। আমার কাছে টিক্কা খানের সই করা পাশ আছে, আমাকে কেউ ধরবে না।'

গাড়ি সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছাকাছি আসতেই দেখি রোড ব্লক দিয়ে তিন-চার জন সেপাই দাঁড়িয়ে। ওরা গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে কী-সব দেখছে। একটি কালো ভকস ওয়াগনকে দেখলাম রাস্তার পাশে। রোগামতো একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে। একজন সেপাই কী-সব যেন জিজ্ঞেস করছে। দুলাভাই শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি চুপচাপ থাকবে। কথাবার্তা যা বলবার আমি বলব।'

ওরা আমাদের গাড়ি থামাল না। হাত ইশারা করে চলে যেতে বলল। তাকিয়ে দেখি দুলাভাইয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

গেটের সামনে গাড়ি থামতেই জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্না শোনা গেল। আজ সকাল-সকাল কান্না শুরু হয়েছে। দুলাভাই ভীত স্বরে বললেন, 'কাঁদে কে?'

'জলিল সাহেবের বউ।'

'রোজ এ রকম কাঁদে?'

'হ্যাঁ।'

'শফিক--'

'জ্বি।'

'তুমি খোঁজখবরের মধ্যে যাবে না। সময়টা খারাপ--' দুলাভাই কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন।

'আসেন, উপরে যাই। চা খেয়ে যান।'

'না থাক। দেরি হয়ে যাবে।'

'দেরি হবে না।'

'না থাক।'

দুলাভাই "না" বলেও গাড়ি থেকে নেমে আমার সঙ্গে উপরে উঠতে লাগলেন।

'শফিক, আমিও নীলগঞ্জে চলে যাব।'

'ভালোই হবে।'

'আমার ভালো লাগছে না। বড়োই দুঃসময়।'

৪

বিকালবেলা চুপচাপ ঘরে বসে আছি, কিছুই ভালো লাগছে না। সম্ভবত জ্বর আসছে। নিঃসন্দেহ হবার উপায় হচ্ছে সিগারেট ধরান। দু'টি টান দিয়ে যদি ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা হয়, তাহলে নির্ঘাত জ্বর আসছে। পরীক্ষাটা করবার উপায় নেই। সিগারেট ফুরিয়েছে। কাদের মিয়া আনতে গিয়েছে। কখন ফিরবে কে জানে!

আমি একটি চাদর গায়ে দিয়ে বারান্দায় বসলাম। বিলু এল সেই সময়। এই মেয়েটি নিঃশব্দে চলাফেরা করে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসার কোনো শব্দ আমি শুনি নি।

'কী ব্যাপার বিলু?'

'আপনাকে বাবা ডাকছেন।'

'আমি তো যেতে পারব না, আমার জ্বর।'

আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বিলু বলল, 'কই দেখি?' বলেই সে হাত রাখল আমার কপালে। আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম।

'জ্বর কোথায়! আপনার শরীর নদীর মতো ঠাণ্ডা।'

নিজেকে সামলে নিয়ে সহজভাবে বলতে চেষ্টা করলাম, 'কি জন্যে ডাকছেন আমাকে?'

'কি জন্যে তা আমি কী করে বলব?'

বিলু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। এই মেয়েটি খুব অদ্ভুত। এমনি আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ-হাঁ করে জবাব দেয়। আবার কখনো আপনা থেকেই অনেক কথা বলে।

'আজকে আমাদের ক্লাসে কী হয়েছে জানেন? নাজমা নামের একটা মেয়ে ফ্লাস্কে করে দুধ নিয়ে এসেছে, টিফিনের সময় খাবে। সেই দুধ আমরা ক্লাসের মধ্যে ঢেলে ফেললাম। তারপর কী হয়েছে জানেন?'

'না।'

'আমাদের কেমিস্ট্রির স্যার এসে বললেন--এই·······'

বিলুর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, সে কোনো কথা শেষ করবে না। হঠাৎ কথা থামিয়ে বলবে, 'সর্বনাশ, চুলায় গরম পানি দিয়ে এসেছি, মনেই ছিল না। আমি যাই।'

'তোমাদের সেই কেমিস্ট্রি স্যার দুধ দেখে কী বললেন?'

সে চোখ কপালে তুলে বলবে, 'দূর, এই সব শুনে কী করবেন?'

বেশ লাগে আমার বিলুকে।

একটি গরম সুয়েটার গায়ে দিয়ে নামছি, হঠাৎ বিলু নিচু গলায় বলল, 'আমাদের বাসায় দেখবেন একটি লোক বসে আছে। ওর সঙ্গে নীলু আপার বিয়ে হবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তাই নাকি?'

'হুঁ।'

'কবে হচ্ছে বিয়েটা?'

'খুব শিগগির।'

বিলু দেখলাম বেশ গম্ভীর। যেন এই বিয়ের ব্যাপারটি তার ভালো লাগছে না। আমি বললাম, 'তোমার মনে হচ্ছে মন খারাপ?'

'না, মন খারাপ হবে কেন? আপনি কী-যে পাগলের মতো কথা বলেন! খুব রাগ লাগে।'

আমি ঘরে ঢুকে দেখি আজিজ সাহেবের সামনে এক জন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রলোকের মাথাভর্তি টাক। একটা রুমাল দিয়ে তিনি ক্রমাগত মাথার টাক মুছছেন।

আজিজ সাহেব বললেন, 'এই যে শফিক, আস আস। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, এ হচ্ছে মতিনউদ্দিন। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। আমেরিকার নর্থ ডাকোটাতে ছিল অনেক দিন। গত সপ্তাহে হঠাৎ এসে হাজির। দেখ না কাণ্ড! মতিনউদ্দিন---এ হচ্ছে আমাদের বাড়িওয়ালা, তবে আত্মীয়ের চেয়েও বেশি।'

ভদ্রলোক মিহি সুরে বললেন, 'আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

আমি বড়োই অবাক হলাম। আমার কথা অনেক শোনার কোনো কারণ নেই। ভদ্রলোক বিদেশ থেকে ফিরে আজই হয়তো প্রথম এখানে এসেছেন। এই সময়ের মধ্যে আমার কথা শুনে ফেলবেন, সেটা ঠিক বিশ্বাস্য নয়।

আমি হাসিমুখে বললাম, 'কার কাছ থেকে শুনলেন?'

'নীলু বলল।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম নীলুর দিকে। নীলুর এমন এক জন বয়স্ক মোটাসোটা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে, তা ঠিক কল্পনা করা যায় না। নীলু রূপসী এবং অহংকারী। এই জাতীয় মেয়েরা মোটাসোটা টাকওয়ালা লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না। ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'আপনি নাকি এক বার একটা কাক পুষেছিলেন? কাকটার নাম ছিল সম্রাট কনিষ্ক।'

আমাকে মানতেই হল ভদ্রলোক আমার কথা আগেই শুনেছেন। প্রথম দিনই কেউ আমার কাক পোষার কথা জানবে, তা বিশ্বাস করা কষ্টকর।

'নীলু আমাকে সব কিছু লিখত চিঠিতে।'

আমি ভালোভাবে তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে। তাঁর চোখে-মুখে এমন একটি ছেলেমানুষী ভাব আছে, যা ছেলেমানুষদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। ভদ্রলোক চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, 'কাকটা নাকি রাত-দিন আপনার পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করত। সত্যি?'

আমার কাক পোষার ব্যাপারটির মধ্যে এতটা অতিরঞ্জন আছে, তা জানা ছিল না। ঘটনাটি খুলে বলা যাক।

কাকটির সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই আকস্মিক। এক দিন সকালে নাশতা খাবার সময় সে রেলিংয়ের উপর এসে বসল। আমি যথারীতি একটি রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিলাম। সে রুটির টুকরোটি স্পর্শও করল না। ঘাড় বাঁকিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর গলায় ডাকল ক্বা-কা। খাবার স্পর্শ করে না, এই জাতীয় কাক আমি আগে দেখি

নি--কাজেই অবাক হয়ে আরো কয়েক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিলাম। সে যেন আমাকে খুশি করবার জন্যেই একটি টুকরো উঠিয়ে আবার সন্ন্যাসীর মতো বসে থাকল বারান্দায়। সেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। শেষের দিকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকত রেলিংএ। আমাকে দেখতে পেলেই গম্ভীর গলায় ডাকত কা-কা। আমাদের মধ্যে কথাবার্তাও হ'ত। যেমন আমি যদি বলতাম, 'কি হে কনিষ্ক, শরীর ভালো তো?

'কা-কা।'

'তাঁর মানে ভালো নেই। হুঁ। হয়েছেটা কী?'

'কা কা কা' (গম্ভীর আওয়াজ)।

কাদের মিয়ার এই কাক নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তার ধারণা, এটা একটা অলক্ষণ। সে ঝাঁটা নিয়ে অনেক বার তাড়াতে চেষ্টা করেছে। লাভ হয় নি। ছাব্বিশে মার্চের পর এই কাকটিকে আর দেখা যায় নি। কোথায় গিয়েছে কে জানে?

মতিনউদ্দিন সাহেব বললেন, 'কাকটির নাম কনিষ্ক রাখলেন কেন? কনিষ্ক মানে কী?'

'কনিষ্ক হচ্ছে কুষাণ বংশের এক জন সম্রাট। ভারতে রাজত্ব করে গেছেন আনুমানিক ১০০ খ্রিষ্টাব্দে।'

মতিনউদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'নীলু ঠিকই বলেছে, আপনি ভাই অদ্ভুত লোক।' নীলু রেগে গিয়ে বলল, 'আমি আবার কখন এই সব বললাম?'

মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দুপুরে আমাকে ভাত খেতে হল। অন্যের বাড়িতে ভাত খেতে ভালো লাগে না। বড়োই অস্বস্তি বোধ হয়। সেখানে ভাত মাখাতে হয় ভদ্রভাবে। লক্ষ রাখতে হয় ঠোঁটে ভাত লেগে আছে কিনা। হাত দিয়ে লবণ না নিয়ে চামচ দিয়ে নিতে হয়। সেই চামচটি আবার ধরতে হয় বাঁ হাতে। আমি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অন্যের বাড়িতে খেতে বসি না। এখানেও নিতান্ত বাধ্য হয়ে বসতেই হল। যখন নীলুর মতো একটা মেয়ে নরম স্বরে বলে, 'আপনি না খেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। আমি রান্না করেছি আপনার জন্যেই।' তখন অবাক হয়ে খেতে বসতেই হয়।

নীলু আমার সঙ্গে কথাটথা বিশেষ বলে না। মাসের প্রথম দিকে বাড়িভাড়ার টাকাটা খামে ভরে দিতে এসে টেনে টেনে বলে, 'টাকাটা গুনে নিন।'

আমি সব সময়ই বলি, 'গুনতে হবে না, ঠিক আছে।'

সে ঠাণ্ডা স্বরে বলে, 'না, গুনে নিন।'

আমাকে চোখ-মুখ লাল করে টাকা গুনতে হয়। রূপসী একটা মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে টাকা গোনা বিড়ম্বনা বিশেষ। এক সময় সে বলে, 'ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে।'

মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে ভাত খেতে খেতে মনে পড়ল--এবার নীলু ভাড়া দিতে এসে টাকা গুনে নেবার কথা বলে নি। আমি যখন নিজ থেকে গুনতে যচ্ছি, তখন বলেছে, 'শফিক সাহেব, আপনার যদি অস্বস্তি লাগে, তাহলে থাক--গুনতে হবে না। আমি গুনে এনেছি।'

অন্য বারের মতো টাকাটা দিয়েই নিচে নেমে যায় নি, হঠাৎ করে বলেছে, 'আপনার বন্ধু কনিষ্কের কোনো খোঁজ পেলেন?'

'না, এখনো পাই নি।'

'আমার মনে হয়, সে মনের দুঃখে বিবাগী হয়েছে।'

নীলু খিলখিল করে হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনি খুব সুখে আছেন শফিক সাহেব। কাজটাজ কিছু করতে হয় না। বাড়িভাড়া নেন, আর ঘুরে বেড়ান।'

আমি উত্তর দিলাম না। সে দেখলাম খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করেন।'

'তাই নাকি?'

'তাঁর ধারণা, আপনার মতো ভালো ছেলে খুব কম জন্মায়।'

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, 'উনি আমার পা দেখতে পান না তো, তাই বলেন।'

এরপর কথা আর এগোয় নি। নীলু মুখ কালো করে নিচে নেমে গেছে। আমি নিজেও ভেবে পাই নি, হঠাৎ এই প্রসঙ্গ কেন তুললাম। না ভেবেচিন্তে মানুষ অনেক কিছুই বলে। আর বলে বলেই আমরা ভালো মানুষ আর মন্দ মানুষকে আলাদা করতে পারি। এই যেমন আজ মতিনউদ্দিন সাহেব ভাত মাখতে মাখতে বললেন,'মিলিটারিগুলি দেখতে বেশ লাগে। কেমন স্মার্ট।'

ভদ্রলোকের এই কথা থেকেই বোঝা যায়, এর মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। এখনো মিলিটারি দেখে যে মুগ্ধ হয় সে কিছু পরিমাণে ছেলেমানুষ। স্বামী হিসেবে এ ধরনের মানুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে যাচ্ছি, তখন কাদের এসে উপস্থিত। সে আমাকে এক কোণায় নিয়ে চোখ ছোট করে বলল, 'ছোড ভাই, রোজ কেয়ামত।'

'কী হয়েছে?'

'রফিক সাহেবের ছোড ভাইয়ের খেল খতম।'

'কী বলিস!'

'কোনো খোঁজ নাই। তার মা ফিট হয় আর উঠে, আবার ফিট হয়।'

আমি ভালোমতো বিদায় না নিয়েই গেলাম রফিকের বাসায়। বাসায় দেখি অনেক লোকজনের ভিড়। একটি ছোটমতো নীল রঙের গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢুকে দেখি রফিকের ছোট ভাই বসার ঘরে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তাকে ঘিরে বহু লোকজন।

রফিক আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এল, 'খবর পেলি কার কাছে?'

'হয়েছেটা কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'শুনিস নি কিছু?'

'না।'

'কাল বিকালে বাইরে গিয়েছিল। সারা রাত আর ফেরে নি। আমাদের অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছিস। মা রাতে তিন বার ফিট হয়েছে।'

'গিয়েছিল কোথায়?'

'ওর এক বন্ধুর বাড়ি। দেরি হয়েছিল বলে ওরা আর আসতে দেয় নি। বুঝে দেখ আমাদের অবস্থা।'

রফিকের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দেখি আরো লোকজন আসছে। ঢাকা শহরের সব লোকজন কি জেনে গেছে নাকি--রফিকের ছোট ভাই কাল রাতে বাড়ি ফেরে নি?

ঘরে ফিরে দেখি মতিনউদ্দিন সাহেব দোতলার বারান্দায় বসে সিগারেট টানছেন। জুতো-টুতো খুলে পা তুলে বসেছেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, 'সিগারেট খাবার জন্যে আসলাম। মুরুব্বিদের সামনে তো আর খাওয়া যায় না। কী বলেন?'

'তা তো ঠিকই। চা খাবেন?'

'তা বেশ তো। চা খেলে তো ভালোই হয়। অসুবিধা তো কিছু দেখছি না।'

লোকটির মাথায় কি ছিট আছে? আমি আড়চোখে তাকালাম তাঁর দিকে। কেমন নিশ্চিন্তে পা তুলে বসে আছেন। কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই।

'শফিক ভাই, আমি বসে বসে এতক্ষণ আপনার কাকটার কথা ভাবছিলাম, যার নাম রেখেছিলেন কনিষ্ক।'

'কী ভাবছিলেন?'

'না, বলা ঠিক হবে না আপনাকে।'

আমি আচমকা বললাম, 'আমেরিকায় কী করতেন আপনি?'

'পড়াশোনা। পি-এইচ. ডি করেছি এগ্রনমিতে।'

আমি অবাক হয়েই তাকালাম। কে বলবে এই লোকটির একটি পি-এইচ. ডি ডিগ্রী আছে? কেমন নির্বোধ চোখ। ঢিলাঢালা ভাবভঙ্গি। মতিনউদ্দিন সাহেব বিকাল পর্যন্ত আমার বারান্দায় বসে রইলেন। সন্ধ্যার আগে আগে তাঁকে নিতে তাঁর বড়ো ভাই আসবেন গাড়ি নিয়ে। তিনি গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। বিলু এক বার এসে বলল নিচে যেতে। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, বারান্দায় বেশ বাতাস, তিনি বাতাস ছেড়ে নিচে যেতে চান না। বিলুকে এইটুকু বলতেই তাঁর কান-টান লাল হয়ে একাকার হল।

সন্ধ্যাবেলা কোনো গাড়ি এল না। শোনা গেল, ঝিকাতলা এলাকায় কী–একটা ঝামেলা হয়েছে। ঝিকাতলা থেকে ধানমণ্ডি পনের নম্বর পর্যন্ত প্রতিটি বাড়ি নাকি সার্চ করা হবে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে একটা জীপে মাইক লাগিয়ে বলা হল, এই অঞ্চলে পরবর্তী নির্দেশ না–দেওয়া পর্যন্ত কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরই কারেন্ট চলে গেল। কাদের হারিকেন জ্বালিয়ে আবার নিভিয়ে ফেলল। মিলিটারি সার্চের সময় অন্ধকার থাকাই নাকি ভালো। এতে তারা মনে করে, বাড়িতে লোকজন নেই। মতিনউদ্দিন সাহেব একেবারেই চুপ হয়ে গেলেন। বিলু যখন এসে বলল--খাবার দেওয়া হয়েছে, তিনি বললেন--তাঁর একেবারেই খিদে নেই।

গভীর রাত পর্যন্ত আমি এবং মতিনউদ্দিন সাহেব অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ বসে রইলাম, রাত একটায় বাসার সামনে দিয়ে একটি খোলা জীপ গেল। সেই জীপটিই আবার রাত দেড়টার দিকে ফিরে গেল।

আমি বললাম, 'ঘুমুবেন নাকি মতিন সাহেব? কাদের জায়গা করেছে।'

মতিন সাহেব শুকনো গলায় বললেন, 'না, ঘুম আসছে না।'

আমি বললাম 'ভয় লাগছে না?'

'জ্বি–না। বড্ড মশা।'

মতিন সাহেব সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ বললেন, 'এটা বাংলা কোন মাস?'

তাঁর কথার জবাব দেবার আগেই জলিল সাহেবের স্ত্রীর কান্না শোনা গেল।

'কে কাঁদে?'

'জলিল সাহেবের স্ত্রী। ওর স্বামীর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কী সর্বনাশ, বলেন কী আপনি!'

মতিন সাহেব এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, যেন এ রকম ভয়াবহ কথা এর আগে শোনেন নি। সেই খোলা জীপটা এসে থামল বাসার গেটের কাছে। কাদের ফিসফিস করে বলল 'দোয়া ইউনুস পড়েন ছোড ভাই। ভয়ের কিছু নাই।'

দোয়া ইউনুস কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। কাদের মতিন সাহেবের শার্ট টেনে চাপা স্বরে বলল 'সিগারেট ফেলেন। আগুন দূর থাইক্যা দেখা যায়।'

গাড়িটি এইখানে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? না, চলতে শুরু করেছে। এই তো যাচ্ছে বড়ো রাস্তার দিকে। আমার দোয়া ইউনুস মনে পড়ল। লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবাহানকা ইনি কুন্তু মিনায যোয়ালেমিন।

৫

জলিল সাহেবের ভাই এখনো দেশে ফেরেন নি।

সমগ্র ঢাকা শহর চষে বেড়াচ্ছেন। কীভাবে-কীভাবে যেন এক জন কর্নেলের সঙ্গে দেখা করে দরখাস্ত দিয়ে এসছেন। দৈনিক পাকিস্তানে 'সন্ধান চাই'---এই শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং সন্ধানদাতাকে নগদ পাঁচ শ' টাকা পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করেছেন।

পুরস্কার ঘোষণা কাজে দিয়েছে বলা যেতে পারে। কালো মতো লম্বা এক লোক এসে হাজির।। তার চোখে নিকেলের চশমা, নিচের পাটির একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধান। জলিল সাহেবের ভাই লোকটিকে আমার কাছে এনে হাজির করলেন। লোকটির বক্তব্য, বিজ্ঞাপনের বর্ণনা মতো এক জন লোক মীরপুর বারো নম্বরে আটক আছে। তাকে ছাড়িয়ে আনা যাবে না, তবে এক হাজার টাকা দিলে সে দেখা করিয়ে দিতে পারে। আমে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললাম, 'আপনি নিজে দেখেছেন?'

'জ্বি জনাব। নিজে না দেখলে বলি কেন? তবে আগের মতো নাই, অনেক রোগা হয়ে গেছেন।'

'আপনি দেখলেন কীভাবে? মীরপুর বারো নম্বরে আপনি কী করেন?'

'আমার চেনাজানা লোক আছে।'

'বাড়ি কোথায় আপনার?'

'বাড়ি দিয়ে আপনার দরকার কী? দেখা করিয়ে দিলেই তো হয়।'

'কখন দেখা করাবেন?'

'এখন বলতে পারব না। খোঁজখবর নিয়ে বলতে হবে।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন এক কাজ করেন না কেন, জলিল সাহেবকে দিয়ে এক লাইনের একটা লেখা লিখিয়ে আনেন, আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা দেয়া হবে।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠল।

'আপনে আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই। আপনার সাথে ভাই আমি নাই। আমার এক কথা, আমি দেখা করিয়ে দিব। কিন্তু টাকাটা আমাকে এখন দিতে হবে।'

'এখন দিতে হবে?'

'জ্বি জনাব। অর্ধেক এখন দেন, আর বাকি অর্ধেক দেখা হওয়ার দিন দেন। ব্যস, সাফ কথা।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় কাদেরকে বললাম, 'এই লোকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দে কাদের।'

জলিল সাহেবের ভাই দারুণ অবাক হয়ে বললেন, 'আরে না-না। এই সব কী বলছেন? আসেন তো ভাই আপনি আমার সাথে। চা-পানি খান। আসেন দেখি। অবিশ্বাস করার কী আছে? মাবুদে এলাহী, অবিশ্বাস করব কেন? আপনি কি আর

খামাখা মিথ্যা কথা বলবেন?'

সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম লোকটিকে পাঁচ শ' টাকা দেওয়া হয়েছে এবং একটি টিফিন কেরিয়ারে করে গোশত পারোটা দেওয়া হয়েছে পৌছে দেবার জন্যে। লোকটি বলে গেছে সে বৃহস্পতিবার বিকালে এসে জলিল সাহেবের ভাইকে মীরপুর বার নম্বরে নিয়ে যাবে। লোকটি যে আর আসবে না, সেই সম্পর্কে আমি ষোল আনা নিশ্চিত ছিলাম।

কিন্তু সে সত্যি সত্যি বৃহস্পতিবার বেলা দুটার সময় এসে হাজির। খালি টিফিন-কেরিয়ারটিও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সে অবশ্যি দেখা করানর জন্যে জলিল সাহেবের ভাইকে মীরপুরে নিয়ে গেল না। তার জন্যে নাকি অন্য এক বিহারী ব্যক্তির (সুলায়মান খাঁ) সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া প্রয়োজন। সেই লোক রোববার আসবে। রোববারে অবশ্যি দেখা হবে। এই বারও লোকটি একটি কম্বল, একটি বালিশ এবং দু' শ' টাকা নিয়ে গেল।

জলিল সাহেবের ভাইয়ের ধৈর্য সীমাহীন। তিনি রোববার ভোরে গেলেন, মঙ্গলবার দুপুরে গেলেন এবং আবার বৃহস্পতিবার সকালে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা গায়ে জ্বর নিয়ে ফিরে এলেন। আমি দেখতে গেলাম রাতে। বেশ জ্বর। ভদ্রলোক লেপ গায়ে দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন, 'শুয়ে থাকেন, উঠতে হবে না। আজকেও দেখা হয় নি?'

'জ্বি-না। সামনের মাসের দুই তারিখ যাইতে বলে'

'যাবেন?'

'জ্বি-না। ওরা কোনো খোঁজ জানে না। শুধু পেরেশানী করে।'

'এতদিনে বুঝলেন?'

'বুঝেছি আগেই ভাই, কিন্তু কী করব--মিথ্যাটাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।'

'আরো খোঁজখবর করবেন?'

'জ্বি-না, আগামী মঙ্গলবার ইনশাল্লাহ্ দেশের বাড়ি রওনা হব।'

'ঠিক আছে, আপনি বিশ্রাম করেন। পরে কথা বলব।'

'না ভাই, একটু বসেন। এক কাপ চা খান। আমিনা, ও আমিনা।'

আমিনা সম্ভবত জলিল সাহেবের স্ত্রী। কঠিন পর্দা এঁদের। তিনি এলেন না। দরজার ওপাশে খটখট শব্দে জানান দিলেন। জলিল সাহেবের ভাই শান্ত স্বরে বললেন, 'আমিনা, রোজ কেয়ামতের দিন কোনো পর্দা থাকে না। মেয়ে-পুরুষ তখন সব সমান। এখন সময়টা কেয়ামতের মতো। এখন কোনো পর্দা-পুশিদা নাই। তুমি আস চা নিয়া।'

জলিল সাহেবের স্ত্রীকে দেখে আমি বড়োই অবাক হলাম। নিতান্ত বাচ্চা একটি মেয়ে। শ্যামলা ছিপছিপে গড়ন। খুব লম্বা ঘন কালো চুল। এই বয়সের মেয়েরা বেণী দুলিয়ে স্কুলে যায়। হাতভর্তি আচার নিয়ে বারান্দায় বসে চেটে চেটে

খায়। মেয়েটি নিজে থেকেই বলল, 'আপনার কি মনে হয়, তাঁকে মেরে ফেলেছে?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলাম না। মেয়েটি থেমে থেমে বলল, 'তাঁকে কেন মারবে বলেন? সে তো কিছুই করে নাই। সে তো মানুষকে একটা কড়া কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। সাত বৎসর বয়স থেকে কোনো নামাজ কাজা করে নাই। কেন আল্লাহ্ এমন করবেন?'

জলিল সাহেবের ভাই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কাজের কোনো সমালোচনা নাই আমিনা। গাফুরুর রাহিম যা জানেন, আমরা সেইটা জানি না।'

মঙ্গলবার দুপুরে জলিল সাহেবের ভাই সবাইকে নিয়ে চাঁদপুর চলে গেলেন। একটি ঠিকানা দিয়ে গেলেন কোনো খবর থাকলে জানাবার জন্যে। ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে থাকলেন। আমার কিছু একটা বলা উচিত। কোনো একটা আশার কথা। অর্থহীন কোনো সান্ত্বনার বাণী। কিছুই বলতে পারলাম না।

রাত্রে অনেক দিন পর কোনো কান্না শোনা গেল না। তাদের তালা-দেওয়া বাড়ির সামনে একটা কুকুর এসে শুয়ে থাকল। রাত দশটার দিকে দেখি সেই বাড়ির বারান্দায় বসে নেজাম সাহেব সিগারেট টানছেন। জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর বেশ খাতির হয়েছিল। প্রায়ই দেখতাম দু' জন একসঙ্গে বেরুচ্ছেন।

মতিনউদ্দিন সাহেব আজকাল খুব ঘনঘন আসেন। আজিজ সাহেবের ঘরে না গিয়ে সরাসরি উঠে আসেন দোতলায়। আমার খোঁজ করেন না, চিকন সুরে কাদেরকে ডাকেন, 'ও কাদের মিয়া। কাদের আছ নাকি?'

কাদের সাড়া দিলেই তিনি অসংকোচে বলেন, 'কাদের মিয়া, রাতে এখানে খাব।'

বড়োই আশ্চর্য লাগে আমার কাছে। এক দিন বিকালে এসে দেখি, ভদ্রলোক আমার বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে দিব্বি ঘুমাচ্ছেন। কাদের আমাকে ফিসফিস করে বলল, 'ইনার শইলডা খারাপ। গায়ে জ্বর।'

'কাদের, রাত্রে আমি ভাত খাব না। রুটি করবে।'

আমাকে বললেন, 'জ্বর গায়ে ভাত খাওয়াটা ঠিক হবে না। কী বলেন শফিক ভাই?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আপনি কি এইখানেই থাকবেন নাকি?'

ভদ্রলোক আমার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'জ্বরজ্বারি নিয়ে যাব কোথায়? কাজের জন্যে যে ছেলে রেখেছিলাম, সেটাও চলে গেছে। একা-একা থাকি কী করে?'

তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক দু'টি প্রকাণ্ড কালো রঙের স্যুটকেস সাথে করে নিয়ে এসেছেন।

বিলু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে টেনে টেনে খুব হাসতে লাগল। আমার সামনেই নীলুকে বলল, 'আমি তোমাকে কত বার বলেছি, ভদ্রলোকের মাথা পুরোপুরি

খারাপ। তুমি তো বিশ্বাস কর না।'

নীলু খুবই রাগ করল। একেবারে কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। চোখ-মুখ লাল করে বলল, 'কী মনে করে ঘর-বাড়ি নিয়ে আপনি অন্যের বাড়িতে উঠে আসলেন?'

'একলা থাকতে পারি না নীলু। ভয় লাগে।'

'ভয় লাগে! আপনি কচি খোকা নাকি?'

নীলু সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল। আমি অবস্থা সামলাবার জন্যে বললাম, 'এই সময় একা-একা থাকাটা ভয়েরই কথা।'

নিচে থেকে নেজাম সাহেব হৈচৈ শুনে উঠে এসেছিলেন। তিনি মহা উৎসাহে বললেন, 'কোনো অসুবিধা নাই। আপনি ভাই আমার সঙ্গে থাকেন। ভূতের উপদ্রব এই বাড়িতে। একা-একা থাকতে আমারো ভয় লাগে।'

মতিনউদ্দিন সাহেব পরদিন কাদেরকে নিয়ে বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে এলেন। মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে বিরাট এক একতলা বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। কাদেরের ভাষায় ঐ বাড়িতে একা-একা জ্বীনও থাকতে পারে না। আশেপাশে কোনো বাড়িতে কোনো লোক নেই। এই ক'দিন ভদ্রলোক কী করে একা-একা ছিলেন তাই নাকি এক রহস্য।

কাদেরের কাছ থেকে আরো জানা গেল যে, মতিনউদ্দিন সাহেব এই দেশে থাকবেন না--আবার চলে যাবেন। ভিসার জন্যে দরখাস্ত করেছেন। নতুন ব্যবস্থায় আজিজ সাহেব মহা খুশি। তাঁর মতে এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা। সব দিক থেকেই ভালো। নীলুর মনোভাব ঠিক বোঝা যায় না। তাকে মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে গল্পটল্প করতে দেখি না, তবে এক দিন দেখলাম জামগাছের নিচে দু' জনে কথা বলতে-বলতে হাঁটছে। আমাকে দেখতে পেয়ে নীলু চট করে আড়ালে সরে গেল। কী জন্যে কে জানে?

আজিজ সাহেব আজকাল আর আগের মতো আমাকে ডেকে পাঠান না। তাঁর ব্যস্ততা হঠাৎ করে খুব বেড়েছে। তিনি স্থির করেছেন ছাব্বিশে মার্চের পর থেকে কোথায় কী হচ্ছে সব লিখে রাখবেন। লেখার কাজটা করবে বিলু। তিনটি আলাদা খাতা করা হয়েছে। একটিতে লেখা হচ্ছে পাকিস্তান রেডিওর খবর, অন্যটিতে আকাশবাণী কলকাতার। তৃতীয়টি হচ্ছে স্বাধীন বাংলা, বি বি সি এবং ভয়েস অব আমেরিকার জন্যে।

জুন মাসে ঢাকার অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গেল। কার্ফু সময়সীমা কমিয়ে রাত বারটা থেকে সকাল ছটা করা হল। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় যে-সব মিলিটারি চেকপোস্ট ছিল, সেখান থেকে মিলিটারি সরিয়ে পুলিশ বসান হল। ঢাকার সমস্ত পুলিশ মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে বলে যে-খবর পেয়েছিলাম সেটি বোধ হয় পুরোপুরি সত্যি নয়। চারদিকে প্রচুর পুলিশ দেখা যেতে লাগল।

সেন্ট্রাল শান্তি কমিটি থেকে বলা হল, সমগ্র দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এক জন ফরাসী সাংবাদিক পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন 'দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার সার্বিক উন্নতি হয়েছে। তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা তাঁর চোখে পড়ে নি। জনগণের মধ্যে আস্থার ভাব পুরোপুরি ফিরে এসেছে।'

নীলক্ষেতের রাস্তা দিয়ে আসবার সময় দেখি মহসিন হলের অনেকগুলি জানালা খোলা। ছেলেরা দড়িতে শার্ট শুকতে দিয়েছে। সত্যি সত্যি হল খুলে দেয়া হয়েছে নাকি? হতেও পারে। পত্রিকায় দেখলাম আসন্ন রমজান উপলক্ষে রেশনে ঘি এবং সুজি দেওয়া হবে।

ঠিক এই সময় রফিকের ছোট ভাইটির বিয়ে হয়ে গেল। হঠাৎ করেই নাকি সব ঠিক হয়েছে। দুপুরবেলায় বিয়ে। আমাকে বরযাত্রী যেতে হল। রফিককে মনে হল বেশ সংকুচিত। তাকে বাদ দিয়ে ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এই কারণেই কিনা কে জানে।

বিয়েবাড়িতে গিয়ে দেখি হুলস্থূল কারবার। গেটের সামনে ব্যাণ্ড পার্টি। ছোট-ছোট মেয়েরা পরীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়ো ভালো লাগল দেখে। গেট-ধরনীরা হাজার টাকার কমে গেট ছাড়বে না। শুধু টাকা দিলেই হবে না। তিনটি ধাঁধা আছে, ভেতরে ঢুকতে হলে সেগুলিও ভাঙতে হবে। একটি ধাঁধা হচ্ছে, কাটলে কোন জিনিস বড়ো হয়। বরযাত্রী যারা ছিলাম, কারোর বুদ্ধিসুদ্ধি বোধহয় সে-রকম নয়। আমরা কেউই একটি ধাঁধারও উত্তর দিতে পারলাম না। বাচ্চা মেয়েগুলি খুব হাসাহাসি করতে লাগল। হাসাহাসি করলে কী হবে, সবগুলি বিচ্ছু--গেট খুলবে না। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বাবা এসে ধমক দিলেন, 'গেট খোল। সব সময় ফাজলামি।'

বিয়ে পড়ান হয়ে গেল নিমেষের মধ্যেই। 'দেন মোহরান'--যা নিয়ে দু' পক্ষই ঘন্টাদুয়েক দড়ি টানাটানি করেন, তাও দেখি আগেই ঠিক-করা। শুধু কবুল বলে নাম সই। বিয়ে বলতে এইটুকুই।

খেতে গিয়েও দেখি এলাহী ব্যবস্থা। জনপ্রতি ফুল রোস্ট, কাবাব, রেজালা। আমার পাশে রোগামতো একটি লোক বসেছিলেন। সে আমার পেটে খোঁচা মেরে ফিসফিস করে বলল, 'ব্রিগেডিয়ার বখতিয়ার এসেছে, দেখেছেন?

'কোথায় ব্রিগেডিয়ার বখতিয়ার?'

'ঐ যে দেখছেন না, সানগ্লাস পরা। খাস পাঞ্জাব রেজিমেন্ট আর্মড কোরের লোক। বডি দেখেছেন?'

আমি দেখলাম, লম্বা করে রোগামতো একটি লোক। বেশ কিছু লোক ঘুরঘুর করছে তার সঙ্গে।

'কত বড়ো দালাল দেখেছেন? পাঞ্জাবীর সাথে পিতলা খাতির।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই রফিক আমাকে বউ দেখাতে নিয়ে গেল। মেয়েটি দেখে আমি স্তম্ভিত। যেন সত্যি সত্যি একটি জলপরী বসে আছে। এমন সুন্দর

মেয়েও পৃথিবীতে আছে!

৬

দুপুরবেলা হঠাৎ চারদিক অন্ধকার করে ঝড় এল।

জামগাছ থেকে শনশন শব্দ উঠতে লাগল, একতলার কলঘরের টিনের চাল উড়ে চলে গেল। ঝড় একটু কমতেই শুরু হল বর্ষণ। তুমুল বর্ষণ। দরজা–জানালা সব বন্ধ, তবু ফাঁক দিয়ে পানি এসে ঘর ভাসিয়ে দিল। কাদের মহা উৎসাহে ছোটাছুটি করছে। এক বার নিচে যাচ্ছে, আবার উপরে উঠে আসছে। তার ব্যস্ততা সীমাহীন ব্যস্ততা। আমি চা করতে বলেছিলাম, সে তার ধার দিয়েও যাচ্ছে না। এক বার এসে হাসিমুখে বলল, 'বিলু আফার ঘরের একটা জানালার কাম সাফ । উইড়া গেছে।'

উল্লসিত হওয়ার মতো কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু কাদেরের মনস্তত্ত্ব বোঝার সাধ্য আমার নেই। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'হাসি তামাশার কী আছে এর মধ্যে?'

ঠিক এই সময় একতলা থেকে নেজাম সাহেব ভীত স্বরে ডাকতে লাগলেন, 'শফিক ভাই শফিক ভাই।' আমার উত্তর দেবার আগেই কাদের মিয়া বিদ্যুৎগতিতে নিচে নেমে গেল। সেখান থেকে সেও চেঁচাতে লাগল, 'ও ছোড মিয়া, ও ছোড মিয়া।' আমি গিয়ে দেখি জলিল সাহেব। মাথার চুল কামান। গায়ে একটি গেঞ্জি এবং ফুল প্যান্ট।

আমাকে দেখে বললেন, 'ভালো আছেন শফিক ভাই?'

নেজাম সাহেব বললেন, 'হাতটার অবস্থা দেখেছেন?'

হাতের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠলাম। তাঁর বাঁ হাতটি কনুইয়ের নিচ থেকে শুকিয়ে গেছে। আমি বললাম, 'আপনার বউ আর মেয়ে ভালো আছে। আপনার ভাই এসে তাদের নিয়ে গেছে চাঁদপুর।'

জলিল সাহেবের কোনো ভাবান্তর হল না। থেমে থেমে বললেন, 'খিদে লাগছে, ভাত খাব।'

ভাত খেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল তাঁর প্রচণ্ড জ্বর। চোখ রক্তবর্ণ । মনে হল কাউকে চিনতে পারছেন না।

নেজাম সাহেব বললেন, 'জলিল ভাই আমাকে চিনতে পারছেন? আমি নেজাম।'

জলিল সাহেব উত্তর দেন না।

'কি, চিনতে পারছেন না?'

জলিল সাহেব বললেন, 'পানি দেন ভাইসাব, তিয়াস লাগে।'

কাদের দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার আনল। আর আমাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে জলিল সাহেব রাত একটার সময় মারা গেলেন। মারা যাবার আগমুহূর্তে খুব সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতো কথাবার্তা বললেন। বউ কোথায়? মেয়েটি কেমন আছে জিজ্ঞেস করলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নেজাম সাহেব বললেন, 'হাতটা এ রকম হল কেন?'

জলিল সাহেব তার উত্তর দিলেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?'

'মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। গুলিস্তানের কাছ থেকে।'

'কবে ছেড়েছে?'

'গত পরশু।'

'বলেন কী! এই দুই দিন তাহলে কোথায় ছিলেন?'

জলিল সাহেব তার উত্তর দিলেন না। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হল। আমি চলে এলাম উপরে। এসে দেখি মতিনউদ্দিন সাহেব ইজি চেয়ারে বসে হাউমাউ করে কাঁদছেন।

ঝড়-বৃষ্টি কেটে গিয়ে মধ্যরাতে আকাশ কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রকাণ্ড একটি চাঁদ ঝকমক করতে লাগল সেখানে। সেই অসহ্য জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে থেকে শুনলাম, অনেক দিন পর জলিল সাহেবের বউ কাঁদছে। সরু মেয়েলি গলায় গাঢ় বিষাদের কান্না।

'কে কাঁদছে?'

কাদের মিয়া বলল, 'বিলু আফা কানতাছে।'

বিলু নীলু দুই বোন সমস্ত রাত জলিল সাহেবের মাথার পাশে বসে রইল।

৭

মৌলবী ইজাবুদ্দিন সাহেব, (এম.এ., এল-এল.বি) খবর পাঠিয়েছেন--আমি যেন অবশ্যি তাঁর সঙ্গে দেখা করি, বিশেষ প্রয়োজন। দু' বার গিয়ে তাঁকে পেলাম না। তিনি আজকাল ভীষণ ব্যস্ত। বাসায় টেলিফোন এসেছে। সন্ধ্যার পর দু' জন আনসার তাঁর বাড়ি পাহারা দেয়। আগে তাঁর বাড়ির বারান্দায় কোনো আলো ছিল না। এখন তিন দিকে এক শ' পাওয়ারের তিনটি বাতি জ্বলে।

কোনো মানুষকে দু' বার গিয়ে না পাওয়া গেলে তৃতীয় বার যাওয়ার উৎসাহ থাকে না। তাছাড়া আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে তাঁর বিশেষ প্রয়োজন হওয়ার কোনোই কারণ নেই। আমি আর না যাওয়াই ঠিক করলাম। তৃতীয় দিন ইজাবুদ্দিন

সাহেব আমাকে নেওয়ার জন্যে গাড়ি পাঠালেন। গাড়িতে অসম্ভব রোগা এবং অসম্ভব লম্বা একটি লোক বসে ছিল। সে কড়া গলায় বলল, 'আপনাকে ডাকা হয়েছে, তবু আপনি আসেন নাই কেন?'

আমার সঙ্গে কেউ কড়া গলায় কথা বললে আমি সাধারণত কড়া গলায় জবাব দিই। কিন্তু দিনকাল ভালো নয়, কাজেই সহজ ভঙ্গিতে বললাম, 'আপনি কে?'

'তা দিয়ে আপনার দরকার কী?'

'আপনি কি ইজাবুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কাজ করেন? আপনাকে তো দেখি নি।'

'আপনি বেশি কথা বলেন। বেশি কথা বলা ঠিক না।'

'ঠিক না কেন বলেন তো?'

লোকটি কঠিন মুখে চুপ করে রইল।

ইজাবুদ্দিন সাহেব কিন্তু এমন ভাব করলেন, যেন আমি এক জন মহা সম্মানিত ব্যক্তি। গাড়ি থামামাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নরম স্বরে বললেন, 'আসতে কোনো তকলিফ হয় নাই তো?'

'না, কোনো তকলিফ হয় নি। ব্যাপারটা কী?'

'আরে না ভাই, কিছু না। কথাবার্তা বলার জন্যে ডাকলাম। আসেন, ভেতরে গিয়ে বসি।'

ভেতরে অনেক লোকজন বসে ছিল। এঁদের মধ্যে এক জনের মাথায় একটি ঝলমলে ঝুঁটিওয়ালা টুপি। লোকজন এখনো এই জাতীয় টুপি পরে, আমার জানা ছিল না। গাড়ির সেই শুকনো লোকটিকে দেখলাম আলাদা একটা টেবিলে। টেবিলে ফাইলপত্রও আছে। ইজাবুদ্দিন সাহেব বললেন, 'আপনার এইখানে এক জন লোক মারা গেছে শুনলাম। কীভাবে মারা গেল, কী সমাচার?'

আমি বেশ স্পষ্ট স্বরেই বললাম, 'মিলিটারিরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।'

'বলেন কী সাহেব!'

ইজাবুদ্দিন সাহেব এমন ভাব করলেন, যেন অকল্পনীয় একটি ঘটনা শুনলেন। সেই শুকনো লোকটি সরু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তুর্কি টুপি-পরা ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তিনি এক সময় গলার স্বর উঁচু করে বললেন, 'লোকটি কে?'

'আমার এক জন ভাড়াটে। পরহেজগার লোক। সাত বছর বয়স থেকে নামাজ কাজা করে নি।'

ইজাবুদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'বড়োই আফসোসের কথা। সিপাইদের হাতে দু'-একটা এই রকম ঘটনা ঘটেছে। দশ জন মন্দের সাথে এক জন ভালোও শাস্তি পায়। দুনিয়ার নিয়মই এই। আমি ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে নিজে বলব ব্যাপারটা। ভবিষ্যতে এই রকম যেন না হয়।'

আমি চুপ করে রইলাম। তুর্কি টুপি-পরা ভদ্রলোক বললেন, 'মৃত্যু স্বয়ং

আল্লাহ্‌পাকের হাতে। আল্লাহ্‌পাক যদি ঐ লোকের মৃত্যু মিলিটারির হাতে লিখে থাকেন, তা হলে হবেই। আপনি আমি কিছুই করতে পারব না। কি বলেন ইজাবুদ্দিন সাহেব?'

ইজাবুদ্দিন সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না।

আমি বললাম, 'আপনি কি এইটার জন্যেই ডেকেছেন?'

'জ্বি না, আমি ডেকেছি অন্য ব্যাপারে। স্থানীয় কিছু গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে একটা শান্তিসভা হবে, যাতে মানুষের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়। সবারই এখন মিলেমিশে থাকা দরকার। আপনার বাবা ছিলেন এই অঞ্চলের এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। পাকিস্তান হাসেলের জন্যে তিনি যে কী করেছেন তা তো আপনি জানেন না, জানি আমি। জিন্নাহ্‌ সাহেবের সাথে তাঁর চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। তাঁর ছেলে হিসাবে আপনার শান্তিসভাতে থাকা দরকার।'

'আমি থাকব।'

'তা তো থাকবেনই। না থাকলে কি আর আমি ডাকতাম আপনাকে? মানুষ চিনি তো। আপনার দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল সেদিন। তিনি আবার ব্রিগেডিয়ার তোফাজ্জল সাহেবের বিশিষ্ট বন্ধু। ইংল্যাণ্ডে উনার সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার সাহেবের পরিচয়। জানি তো সব, হা-হা-হা।'

ইজাবুদ্দিন সাহেব আমাকে গাড়িতে করে ফেরত পাঠালেন। সেই শুকনো লোকটা এবারেও যাচ্ছে আমার সঙ্গে। তার ভাবভঙ্গি এখন আর আগের মতো নয়। খুব বিনীত অবস্থা। গাড়ি ছাড়ামাত্র বলল, 'কোনো রকম অসুবিধা হলে বলবেন আমাকে।'

'আপনাকে বলব কেন?'

'না, আমি মানে খোঁজখবর রাখি। অনেক রকম কানেকশন আছে, ইয়ে কি যেন বলে.........'

লোকটি থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

বাসায় এসে দেখি বড়ো আপা চিঠি পাঠিয়েছে, তাতে লেখা--'আগামী কাল দুপুরে আমরা নীলগঞ্জে চলে যাচ্ছি। তুমি অবশ্যই তোমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসবে। তোমার দুলাভাইয়ের ধারণা, অবস্থা খুব খারাপ।'

আমি অবস্থা খারাপের তেমন কোনো লক্ষণ দেখলাম না। সব কিছুই বেশ স্বাভাবিক। মুক্তিবাহিনীটাহিনী বলে কিছু নেই বলেই মনে হচ্ছে। বড়ো আপার ধারণা, মুক্তিবাহিনীর সমস্ত ব্যাপারটাই আকাশবাণী কলকাতার দেবদুলাল বাবুর কল্পনায়। বড়ো আপাকে ঠিক দোষও দেওয়া যায় না, কলকাতার খবরগুলির প্রায় বার আনাই মিথ্যা। তাদের খবর অনুসারে যেদিন মুক্তিবাহিনীর বোমায় মগবাজার বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন কেন্দ্র সম্পূর্ণ বিকল বলা হল, তার পরদিনই বড়ো আপার বাসায় যাবার সময় দেখি সব ঠিকঠাক আছে। আরেক দিন বলা হল--মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে

সম্মুখসমরের ফল হিসেবে ঢাকার রাজপথ আজ জনশূন্য। আমি দেখলাম দিব্যি লোকজন চলাচল করছে।

আমার জানামতে দু' জন লোককেই পাওয়া গেল, যাদের স্বাধীন বাংলা বেতার এবং কলকাতা বেতারের খবরের উপর পূর্ণ আস্থা। এক জন আমাদের আজিজ সাহেব, অন্য জন কাদের মিয়া। কাদের মিয়া আবার যা শোনে, তার তিন গুণ বলে। রাতে শোবার আগে সে ইদানীং নিচু গলায় বলছে, 'ছোড ভাই, মিলিটারির পাতলা পায়খানা শুরু হইছে।'

আমি এই জাতীয় আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ দেখাই না, কিন্তু কাদেরের কোনো উৎসাহর প্রয়োজন হয় না।

'বিবিসির খবর ছোড ভাই, চিটাগাং-এ পুরা ফাইট। ঢাকা শহরেও শুরু হইছে। খেইল জমতাছে ছোড ভাই।'

'কই, আমি তো কোনো খেইল দেখি না।'

'ছোড ভাই, এইসব তো দেখনের জিনিস না। ভিতরের ব্যাপার। ইসকুরু টাইট হইতাছে, ছোড ভাই।'

'টাইট দেওয়া হলে তো ভালোই।'

কাদেরের আগের ভাব এখন নেই। আগে সে বাড়িঘর ছেড়ে বড়ো আপার বাসায় গিয়ে ওঠার জন্যে ব্যস্ত ছিল, এখন সে-ব্যস্ততা নেই। তবে তার কাজ অনেক বেড়েছে। প্রতিদিনই এক বার মতিনউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে তার বৈঠক বসে। সেই বৈঠক রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত চলে। এক দিন দেখি--সে মতিনউদ্দিন সাহেবের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিচ্ছে। মতিনউদ্দিন সাহেব লাইটার এগিয়ে দিলেন। সকালবেলা নীলু যখন খবরের কাগজ পড়ে তার বাবাকে শোনায়, কাদের মিয়া সেখানেও হাজির থাকে। এবং পড়া শেষ হলে গম্ভীর হয়ে বলে, 'একটাও সত্যি খবর নাই।' এ ব্যাপারে আজিজ সাহেবও তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

মগবাজারে বড়ো আপার বাসায় গিয়ে দেখি তাদের যাওয়া বাতিল হয়ে গেছে। বড়ো আপা মহাখুশি। কাপড়চোপড় স্যুটকেস থেকে নামান হচ্ছে। বেশ একটা খুশি খুশি ব্যস্ততা।

'তোমাদের যাওয়ার কী হল?'

'তোর দুলাভাইকে জিজ্ঞেস কর, আমি কিছু জানি না।'

দুলাভাই ঠিক পরিষ্কার করে কিছু বলেন না। তাঁর হাবভাবে মনে হল অবস্থা যতটা খারাপ মনে করেছিলেন, ততটা খারাপ নয়। এক দিনে অবস্থা হঠাৎ করে কীভাবে ভালো হয়ে গেল, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এক ফাঁকে বড়ো আপা বললেন--তাঁরা তাজমহল রোডের বিজলী মহল্লায় একটা চারতলা বাড়ি কিনবেন। পঁচানব্বই হাজার টাকা দিলেই পাওয়া যায়। যে-

অবাঙালীর বাড়ি, সে পাকিস্তান চলে যাবে--কাজেই জলের দরে সব কিছু বিক্রি করে দিচ্ছে। দেশের অবস্থা ভালো হলে ঐ লোককে জলের দরে সব কিছু বিক্রি করে চলে যেতে হচ্ছে কেন, তাও পরিষ্কার বোঝা গেল না।

দুলাভাই আমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন। অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললেন, 'এখানের এক জন ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা আছে। তোফাজ্জাল নাম। বেলুচ রেজিমেন্টের লোক। খুবই ভালো মানুষ।'

'আমি জানি, ইজাবুদ্দিন সাহেব বলেছেন।'

দুলাভাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আর কী বলেছে ইজাবুদ্দিন?'

'নাহ্, আর কিছু বলে নি।'

দুলাভাই খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি এদের সঙ্গে মেলামেশা করি না। তোফাজ্জলকে বাসায় পর্যন্ত আসতে বলি না। আমাকে প্রায়ই টেলিফোন করে। কয়েক দিন আগে রাজশাহীর এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছে।'

আমি চুপ করে রইলাম। দুলাভাই ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এদের সাথে বেশি মাখামাখি করা ঠিক না। শীলার বন্ধু লুনাকে তো চেন? ঐ যে খুব সুন্দর দেখতে?'

'হ্যাঁ চিনেছি।'

'ওদের বাড়িতে খুব যাতায়ত ছিল মিলিটারিদের। লুনার বাবা প্রায়ই পার্টিফার্টি দিতেন। এখন শুনলাম, এক মেজর নাকি লুনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। ক্লাস নাইনে পড়ে মেয়ে, চিন্তা করে দেখ অবস্থাটা।'

'বিয়ে হচ্ছে?'

দুলাভাই দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, 'না হয়ে উপায় আছে? তবে আমি লুনার বাবাকে বলেছি সবাইকে নিয়ে সরে পড়তে। লোকটা ঘাবড়ে গেছে।'

নীলুর সঙ্গে মতিনউদ্দিন সাহেবের বিয়ে সম্পর্কে যা শুনেছিলাম, তা বোধ হয় ঠিক নয়। বিলুকে এক দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছে, 'দূর, কী যে বলেন! আপনিও কি মতিন ভাইয়ের মতো পাগলা নাকি?'

বিলুর কথা অবশ্যি ধর্তব্য নয়। সে কখন কী বলে, তার ঠিক নেই। কখন সে রেগে আছে আর কখন শরিফ মেজাজে আছে, তাও বোঝা মুশকিল। এক দিন জিজ্ঞেস করলাম, 'বিলু, মতিন সাহেব শুনলাম আমেরিকা ফিরে যাবেন, সত্যি নাকি?'

বিলু সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেল। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'যেতে চাইলে যাক, আমরা কি তাকে ধরে রেখেছি?'

'রাগ করছ কেন বিলু?' আমি বিব্রত হয়ে বললাম।

'রাগ করলাম কোথায়? রাগের কী দেখলেন? আমি কি আপনাকে বকেছি, না কিছু বলেছি?'

বিলু মেয়েটিকে আমার বড়োই দুর্বোধ্য মনে হয়। পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ের মধ্যে এতটা দুর্বোধ্যতার কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

এক দিন দুপুরবেলা আমাকে এসে বলল, 'শফিক ভাই, "নীপা" শব্দের অর্থ জানা আছে আপনার?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না তো? কী জন্যে?'

'জানবার জন্যে? "এসো নীপবনে এসো ছায়াবীথি তলে" এই গানটি শোনেন নি আপনি?'

'শুনেছি।'

'ঐ জায়গায় তো "নীপ" শব্দটি আছে--এর মানে কী? নীলু আপা জানতে চাচ্ছে?'

'জানি না আমি। চলন্তিকা দেখে বলতে হবে।'

'কখন বলবেন?'

'আমার কাছে চলন্তিকা নেই। খুঁজে দেখতে হবে, রফিকের হয়তো আছে। তার ছোট ভাই বইপত্রের পোকা।'

'বেশ, তাহলে আজকে সন্ধ্যার আগে বলবেন, খুব জরুরী।'

সন্ধ্যাবেলা নীপ শব্দের মানে জেনে ঘরে ফিরছি, গেটের কাছ দেখা নীলুর সঙ্গে। আমি বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'নীপ শব্দের মানে হচ্ছে কদম্ব। নীপবন হচ্ছে কদম্ববন।'

নীলু মনে হল খুবই অবাক হল। আমি বললাম, 'বিলু বলছিল তুমি এর মানে জানতে চাও?'

নীলু ইতস্তত করে বলল, 'বিলু প্রায়ই আসে আপনার কাছে, তাই না?'

'তা আসে।'

'শফিক ভাই, ওকে আপনি প্রশ্রয় দেবেন না। বিলুর বয়স কম। এই বয়সে মেয়েরা অনেক মন-গড়া জিনিসকে সত্যি মনে করে।'

আমি অবাক হয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম নীলুর দিকে। নীলু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'জলিল সাহেবের স্ত্রীকে কি আপনি খবর পাঠিয়েছেন?'

'না। তার ভাইকে চিঠি দিয়েছি।'

'উত্তর এসেছে কোনো?'

'না।'

'আসলে আমাকে জানাবেন।'

৮

সকালে কাদেরকে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছি, সে সিগারেট না নিয়ে ফিরে এল।

তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

'ছোড ভাই, কাম সাফ। খেল খতম পয়সা হজম!!'

সে খবর এনেছে, জেনারেল টিক্কা খানকে মেরে ফেলা হয়েছে। এত বড়ো খবরের পর সিগারেটের মতো নগণ্য জিনিসের কথা তার মনে নেই। দু' দিন পরপর কাদের এই জাতীয় খবর নিয়ে আসে। এক বার খবর আনল বেলুচী এবং পাঞ্জাবী এই দুই দলের মধ্যে গণ্ডগোল লেগে ঢাকা কেন্টনমেন্টে দু' দলই শেষ। একদম পরিষ্কার।

আরেক বার দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের দোকান থেকে পাকা খবর আনল, মেজর জিয়া চিটাগং এবং কুমিল্লা দখল করে ঢাকার দিকে রওনা হয়েছে। দাউদকান্দিতে তুমুল 'ফাইট' হচ্ছে। রাত গভীর হলেই নাকি কামানের শব্দ শোনা যাবে।

বলাই বাহুল্য, টিক্কা খানের মৃত্যুসংবাদটিও বাচ্চু ভাইয়ের দোকান থেকেই এসেছে। আমি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে কাদেরকে দোকানে ফেরত পাঠালাম। সিগারেট ছাড়া আমি সকালের চা খেতে পারি না। কাদের ফিরল না। ঠিক দু' ঘন্টা অপেক্ষা করে নিচে নেমে দেখি আজিজ সাহেবের ঘরে মীটিং বসেছে। নেজাম সাহেব এবং মতিনউদ্দিন সাহেব দু' জনেই মুখ লম্বা করে বসে আছেন। আজিজ সাহেব পায়ের শব্দ শুনেই আমাকে ডাকালেন, 'শফিক, কী সর্বনাশ! আজকে বেরুবে না কোথায়ও। খবর শোন নি?'

'কী খবর?

'টিক্কা মারা গেছে।'

'কে খবর দিয়েছে? আমাদের কাদের মিয়া তো?'

'খবর দেওয়াদেওয়ির কিছু নেই শফিক। সবাই জানে। আমরা জানলাম সবার শেষে।'

আজিজ সাহেব 'আকাশবাণী' ধরে বসে আছেন। এরা খবর দিতে এত দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না। তারা শুধু বলেছে--'ঢাকা থেকে প্রচণ্ড গণ্ডগোলের খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া গেছে।' বি বি সি দিনের বেলা পরিষ্কার ধরা যায় না, রাত না হওয়া পর্যন্ত সঠিক কী ঘটেছে,তা জানা যাবে না। নেজাম সাহেব বললেন, তিনি অফিসে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলেন, অবস্থা বেগতিক দেখে চলে এসেছেন। দোকানপাট যেগুলি খুলেছিল সে-সব বন্ধ করে লোকজন বাড়ি চলে গেছে। রাস্তাঘাটে রিকশার সংখ্যাও নগণ্য। মীরপুর রোডে চেকপোস্ট বসেছে। রিক্সা-গাড়ি সব কিছুই থামান হচ্ছে।

আজিজ সাহেব বললেন, 'কলিজা শুকিয়ে শুকনা কাঠ হয়ে গেছে শফিক। বাঙালী তো চিনে নাই। এখন চিনবে। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখে নাই।'

আমাকে তারা কিছুতেই বের হতে দিল না। আজিজ সাহেব বললেন, 'আজকের দিনটা খুব সাবধানে থাকা দরকার। ওরা পাগলা কুত্তার মতো হয়ে আছে

তো, কী করে না–করে কিছুই ঠিক নাই।'

দুপুরের আগেই কী করে এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটল, তা জানা গেল। জেনারেল টিক্কা খান ফাইলপত্র সই করছিলেন। এমন সময় তাঁর ইউনিটের এক জন বাঙালী অফিসার (সে–ই একমাত্র বাঙালী, যে এখনো টিকে আছে এবং পাক আর্মির কথামতো সমানে বাঙালী মারছে) জেনারেল টিক্কার ঘরে ঢুকল। তাদের মধ্যে ইংরেজিতে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল।

টিক্কা : কী ব্যাপার কর্নেল মইন? এত রাত্রে কোনো প্রয়োজন আছে?

মইন : জ্বি স্যার, আছে।

টিক্কা : বেশ, বলে ফেল। আমার হাতে সময় কম। আমি খুবই ব্যস্ত।

মইন : আপনার সময় কম, কথাটি স্যার সত্যি।

এক পর্যায়ে কর্নেল মইন (নামের ব্যাপারে খানিকটা সন্দেহ আছে। কেউ কেউ বলছে মেজর সাঈদ) রিভলবার বের করে পরপর তিনটে গুলী করলেন।

মতিনউদ্দিন সাহেবকে দেখে মনে হল তিনি কিছুটা দিশাহারা, যেন বুঝতে পারছেন না ঠিক কী হচ্ছে। আমাকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে নিচু স্বরে বললেন, 'টিক্কা সাহেবকে অন্যায়ভাবে মারাটা ঠিক হল না।'

আমার বদ্ধমূল ধারণা, মতিনউদ্দিন সাহেবের মাথায় ছিট আছে। এখন তিনি নেজাম সাহেবের সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ান। যেখানে তিনি আছেন, সেখানেই মতিন সাহেব আছেন। কাদেরের কাছে শুনলাম, নেজাম সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নাকি ভূত দেখেছেন। সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে ছিলেন, সড়সড় শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখেন, জামগাছের ডালে কে যেন বসে আছে। কোনোদিকে কোনো বাতাস নেই, শুধু জামগাছের ডালটি নড়ছে। মতিন সাহেবকে দেখি সব সময় ঘরেই থাকেন। চাকরিবাকরি কিছুই করবেন না নাকি? জিজ্ঞেস করলেই হুঁ–হাঁ করেন, পরিষ্কার কিছু বলেন না।

টিক্কা খানের মৃত্যুপ্রসঙ্গে আমার যা–কিছু অবিশ্বাস ছিল, বিকালের দিকে তা ধুয়ে–মুছে গেল। বড়ো আপার বাসায় যাবার জন্যে বেরিয়েছি, দেখি সত্যি সত্যি খুব থমথমে অবস্থা। দোকানপাট বেশির ভাগই বন্ধ, লোকজন এখানে–ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। ই পি আর হেড কোয়ার্টারের গেটের সামনে বালির বস্তা ফেলে দুর্গের মতো করা। বালির বস্তা আগেও ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যুদ্ধের সাজসজ্জা। সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে মেশিনগান বসান দু'টি কালো রঙের জীপ। সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে রিকশা নিয়ে চলে গেলাম মগবাজারে। রিকশাওয়ালাটি বৃদ্ধ। টানতে পারে না। পাক মটরস পর্যন্ত যেতেই তাকে তিন বার থামতে হল। যতক্ষণ থেমে থাকে, ততক্ষণ সে আমাকে খুশি রাখবার জন্যেই হয়তো গল্পগুজব করে। তার কাছ থেকেই জানলাম––জেনারেল টিক্কা একা মারা যায় নি। তার বউ এবং ছেলেটাও মারা গেছে।

'গুষ্টি নিকাশ হইছে স্যার। নির্বংশ হইছে।'

আমি বললাম, 'খবর কোথায় পেলেন চাচা মিয়া?'

সে গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই সব খবর কি স্যার গোপন থাকে? মুক্তিবাহিনীর লোক শহরে ঢুকছে। লাড়াচাড়া শুরু হইছে।'

'কী লাড়াচাড়া?

'যাত্রাবাড়িতে দুইটা ট্রাক উড়াইয়া দিছে। হেই রাস্তায় দুই দিন ধইরা লোক চলাচল বন্ধ।'

'যাত্রাবাড়ির দিকে গেছিলেন নাকি?'

'কী যে কন! উদিকে কেউ যায়?'

আমাকে দেখে বড়ো আপা বললেন, 'তুই আবার আসলি কী জন্যে? এই বৎসর আর জন্মদিনটিন কিচ্ছু করছি না।'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। দুলাভাই বললেন, 'তুমিও আবার জন্মদিনটিন মনে রাখ নাকি, শফিক? আমার নিজেরও কিন্তু মনে নাই। হা-হা-হা। গিফটটিফট কিছু আছে সঙ্গে, না খালি হাতে এসেছ?'

তখন আমার মনে পড়ল, আজ জুলাইয়ের ৬ তারিখ—শীলার জন্মদিন। বড়ো একটা উৎসবের তারিখ।

'তোর জন্যে সকালেই গাড়ি পাঠাতাম। তোর দুলাভাই বলল অবস্থা থমথমে, তাই পাঠাই নি। তুই আবার জন্মদিনের জন্যে চলে আসলি? ঘর থেকে বার হওয়াই তো এখন ঠিক না।

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'জন্মদিন ভেবে আসি নি। জন্মদিনটিন আমার মনে থাকে না।'

আপা তার স্বভাবমতো সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। দুলাভাই ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন।

'দিলে তো তোমার আপাকে রাগিয়ে। জন্মদিন ভেবে আস নি, এটা বড়ো গলা করে বলার দরকার কী? তুমি দেখি ডিপ্লোমেসি কিছুই শিখলে না। হা-হা-হা।'

জন্মদিনের কোনো আয়োজন হয় নি, কথাটা ঠিক নয়। কিছুক্ষণ পরই দেখলাম শীলার বান্ধবীরা আসতে শুরু করেছে। এরা আশেপাশেই থাকে। এদেরকে বলা হয়েছে। লুনা মেয়েটি একটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে এসেছে। তুলিতে আঁকা ছবির মতো লাগছে মেয়েটিকে। আমি আপাকে বললাম, 'এই মেয়েটির যে এক মেজরের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, হয়েছে?'

আপা সরু গলায় বলল, 'তোকে কে বলেছে?'

'দুলাভাইয়ের কাছে শুনলাম।'

'তোর দুলাভাইকে নিয়ে মুশকিল। পেটে কথা থাকে না। শুধু লোক-জানাজানি

করা, আর মানুষকে বিপদে ফেলা।'

আপা রাগে গজগজ করতে লাগল। আমি জানলে কী-রকম বিপদ হতে পারে, তা বুঝতে পারলাম না। আপার কথাবার্তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। যখন যা মনে আসে বলে। সব মেয়েরাই এ-রকম নাকি? আপা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'জন্মদিন ভেবে আসিস নি, তো কী ভেবে এসেছিস? তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।'

টিক্কা খান মারা যাওয়ার পর দুলাভাইয়ের পরিকল্পনা কিছু বদলেছে কি না জানবার জন্যে আসলাম।'

'টিক্কা খান মারা গেছে, তোকে বলল কে?'

'মারা যায় নি?'

'টিক্কা খান কি মাছি যে থাবা দিয়ে মেরে ফেলবে?'

আপা কোনো এক বিচিত্র কারণে পাকিস্তানী মিলিটারি মারা পড়ছে--এই জাতীয় খবর সহ্য করতে পারে না। আমি আপার রাগী মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করলে সঠিক জানা যেত।'

'আমি যে বললাম, সেটা বিশ্বাস হল না?'

রাত্রে আমাকে থেকে যেতে হল। দুলাভাই আমাকে গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিতে রাজি হলেন না, আবার একা-একা ছাড়তেও চাইলেন না। বড়ো আপার বাসায় আমার রাত কাটাতে ভালো লাগে না। এখানে রাত কাটানর মানেই হচ্ছে সারা রাত বসার ঘরে বসে বড়ো আপা যে কী পরিমাণ অসুখী, সেই গল্প শোনা। দুলাভাই ঠিক দশটা ত্রিশ মিনিটে, 'তুমি তোমার দুঃখের কাহিনী এখন শুরু করতে পার' এই বলে দাঁত মাজতে যান এবং দশটা পঁয়ত্রিশে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েন। আপার দুঃখের কাহিনী অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় না। দুলাভাই ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না, সেই সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ঘন্টাখানিক অপেক্ষা করে আকবরের মাকে চা আনতে বলে, তারপর গলার স্বর যথাসম্ভব নিচে নামিয়ে বলে, 'শফিক, জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে। তুই তো বিশ্বাস করবি না। তোর দুলাভাই একটা অমানুষ।'

'কী যে তুমি বল আপা!'

'কী বলি মানে? তুই কি ভেতরের কিছু জানিস? তুই তো দেখিস বাইরেরটা।'

'বাদ দাও, আপা।'

'বাদ দেব কি? বাদ দেওয়ার কিছু কি আছে? তুই কি ভাবছিস আমি ছেড়ে দেব? নীপু যদি না ছাড়ে, আমিও ছাড়ব না।'

নীপু আমার মেজো বোন। গত পনের বছর ধরে সে আমেরিকার সিয়টলে থাকে। গত বৎসর খবর এসেছে, সে সেপারেশন নিয়ে আলাদা থাকে। আমি আপাকে বললাম, 'নীপুর সঙ্গে তুলনা করছ কেন?

'কেন তুলনা করব না? নীপু কি আমার চেয়ে বেশি জানে না নীপুর বুদ্ধি আমার চেয়ে বেশি? সে যদি সেপারেশন নিতে পারে--আমিও পারি। তুই কি ভাবছিস, আমি এমনি ছেড়ে দেব? ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব না?'

যেহেতু নীপু সেপারেশন নিয়েছে, কাজেই আপার ধারণা হয়েছে সেপারেশন নেবার মধ্যে বেশ খানিকটা বাহাদুরি আছে।

আজ রাত্রে বড়ো আপা তার দুঃখের কাহিনী শুরু করবার সুযোগ পেল না। ঘড়িতে এগারটা বাজল, তবু দুলাভাই ওঠবার নাম করলেন না।

আপা বলল, 'ঘুমাবে না?'

'নাহ্।'

'শরীর খারাপ?'

'নাহ্, শরীর ঠিক আছে।'

'শরীর ঠিক থাকলে ঘুমাতে যাচ্ছ না কেন? তোমার তো সব কিছু ঘড়ির কাঁটার মতো চলে।'

'এই নিয়েও তুমি একটা ঝগড়া শুরু করতে চাও?'

'আমি বুঝি সব কিছু নিয়ে ঝগড়া করি?'

'তা কর। আমি যদি এখন একটা হাঁচি দিই, এই নিয়েও তুমি একটা ঝগড়া শুরু করবে।'

'তুমি হাঁচি দিলেই ঝগড়া শুরু করব!'

'প্রথমে ঝগড়া, তারপর কান্নাকাটি, তারপর খাওয়া বন্ধ।'

বড়ো আপা মুখ কালো করে উঠে চলে গেল। দুলাভাই হোহো করে হেসে উঠলেন।

'কফি খাওয়া যাক। শফিক খাবে?'

'না, কফি ভালো লাগে না। চা হলে খেতে পারি।'

'আমি নিজে বানাচ্ছি, খেয়ে দেখ। খুব সাবধানে লিকার বের করব। সবাই পারে না, খেলেই বুঝবে।'

দুলাভাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হল। সমস্ত অঞ্চল অন্ধকার হয়ে পড়ল। দুলাভাই থেমে থেমে বললেন, 'খুব সম্ভব ট্রান্সমিশন ষ্টেশনটি শেষ করে দিয়েছে।'

শীলা ঘুম থেকে উঠে চিৎকার করতে লাগল। ঘন্টা বাজিয়ে কয়েকটা দমকলের গাড়ি ছুটে গেল। গুলীর আওয়াজ হল বেশ কয়েক বার। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কয়েকটি ভারি ট্রাক জাতীয় গাড়ি গেল।

আমরা সবাই শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। আমার জানা মতে সেটিই ছিল ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর প্রথম সফল আক্রমণ।

৯

দরবেশ বাচ্চু ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

বাচ্চু ভাই একা নয়, তার চায়ের দোকানে রাত ন'টার সময় যে ক'জন ছিল, সবাইকে। আমাদের কাদের মিয়া তাদের এক জন। এত রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে না। রাত আটটায় বি বি সির খবর। এর আগেই সে আজিজ সাহেবের ঘরে উপস্থিত হয়। সেদিনই শুধু দেরি হল।

যে-ছেলেটি খবর দিতে এল সে দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের দোকানের বয়। দশ-এগার বছর বয়স। তাকেই শুধু ওরা ছেড়ে দিয়েছে। তার কাছে জানা গেল রাত ন'টার কিছু আগে দু'-তিন জন লোক এসেছে দোকানে। লোকগুলি বাঙালী। এদের মধ্যে এক জন বেঁটেমতো-মাথার চুল কোঁকড়ান। সে বলল, 'বাচ্চু ভাই এখানে কার নাম?'

বাচ্চু ভাই কাউন্টার থেকে উঠে এলেন।

'আমার নাম। কী দরকার?'

'একটু বাইরে আসেন।'

'ওরা বাচ্চু ভাইকে বাইরে নিয়ে একটা গাড়িতে তুলল। তারপর এসে বাকি সবাইকে বলল, 'জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে থানায় নিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কিছু নাই।'

আমি ছেলেটিকে বললাম, 'দোকানে তালা দিয়ে এসেছিস?'

'হ স্যার। ক্যাশ বাক্সের টেকাও আমার কাছে।'

'কত টাকা?'

'মোট তেত্রিশ টাকা বার আনা।'

'তুই আর এত রাত্রে যাবি কোথায়? থাক এখানে।'

'দরবেশ সাবের বাসাত একটা খবর দেওন দরকার।'

'সকালে দিবি, এখন আর যাবি কীভাবে? কার্ফু না?'

ছেলেটি মাথা চুলকাতে লাগল। বললাম, 'দরবেশ সাবের বাড়িতে আছে কে?'

'তাঁর পরিবার আছে। আর একটা পুলা আছে, নান্টু মিয়া নাম। খালি কান্দে।'

'তুই খাওয়াদাওয়া করেছিস?'

'জ্বি-না।'

'ভাত খা। এখন ঘর থেকে বার হওয়া ঠিক না।'

কাদের মিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে, এই খবরে আমি বিশেষ বিচলিত বোধ করলাম না। সহজ স্বাভাবিকভাবেই চা বানালাম। রাতের জন্যে কাদের কিছু রান্না করে গেছে কিনা, তা দেখলাম হাঁড়ি-পাতিল উল্টে। ছেলেটার শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কিছু গল্পগুজবও করলাম।

'বাড়ি কোথায়?'

'বিরামছরি, ময়মনসিং।'

'বাড়িতে আছে কে?'

'মা আছে, ভইন আছে, দুইটা ভাই আছে। চাইর জন খানেওয়ালা।'

'বোনের বিয়ে হয়েছে?'

'হইছিল, এখন পৃথ্যক।'

এক সময় বিলু এসে আমাকে নিচে ডেকে নিয়ে গেল। আজিজ সাহেবের জ্বর। তিনি কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর সামনের চেয়ারে নেজাম সাহেব বসে আছেন। আমাকে দেখেই নেজাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, 'কাদের মিয়কে শুনলাম শুট করেছে।'

'ধরে নিয়ে গেছে। শুট করেছে কিনা জানি না।'

'কী সর্বনাশের কথা ভাই!' আজিজ সাহেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। থেমে থেমে বললেন, 'মনটা খুব খারাপ আজকে।'

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু বলল, 'আপনার খাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'আপনার জন্য ভাত বাড়ছি। আমি এখনো খাই নি। নীলু আপাও খায় নি।'

'না, আমি খাব না। কাদের রেঁধে গিয়েছে।'

'তবু খেতে হবে।'

নীলু বলল, 'ইনি খেতে চাচ্ছেন না, তবু জোর করছ কেন?'

'না, খেতেই হবে।'

আজিজ সাহেব বললেন, 'কাদেরের ব্যাপারে কী করবে?'

'করার তো তেমন কিছু নেই।'

'তা ঠিক।'

'সকালবেলা ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে যাব।'

আর কোনো কথাবার্তা হল না। বিলু এসে বলল, 'আসুন ভাত দিয়েছি।'

আমি অস্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। ভাত খেতে গিয়ে দেখি, নীলু খেতে আসে নি। তার নাকি মাথা ধরেছে।

বিলু বলল, 'মাথা ধরছে না হাতি, আমার সঙ্গে রাগ। আপনাকে খেতে বলেছি তো, তাই তার রাগ উঠে গেছে। তার রাগ করবার কী?'

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু বলল, 'সে অনেক কিছুই করে, যা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আমি কি রাগ করি?'

'রাগ কর না?'

'মাঝে মাঝে করি, কিন্তু কাউকে বুঝতে দিই না। আমার মুখ দেখে কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। এই যে কাদের বেচারা মারা গেল—'

'কাদের মারা গেছে বলছ কেন?'

৯

দরবেশ বাচ্চু ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে।

বাচ্চু ভাই একা নয়, তার চায়ের দোকানে রাত ন'টার সময় যে ক'জন ছিল, সবাইকে। আমাদের কাদের মিয়া তাদের এক জন। এত রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে না। রাত আটটায় বি বি সির খবর। এর আগেই সে আজিজ সাহেবের ঘরে উপস্থিত হয়। সেদিনই শুধু দেরি হল।

যে-ছেলেটি খবর দিতে এল সে দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের দোকানের বয়। দশ-এগার বছর বয়স। তাকেই শুধু ওরা ছেড়ে দিয়েছে। তার কাছে জানা গেল রাত ন'টার কিছু আগে দু'-তিন জন লোক এসেছে দোকানে। লোকগুলি বাঙালী। এদের মধ্যে এক জন বেঁটেমতো-মাথার চুল কোঁকড়ান। সে বলল, 'বাচ্চু ভাই এখানে কার নাম?'

বাচ্চু ভাই কাউন্টার থেকে উঠে এলেন।

'আমার নাম। কী দরকার?'

'একটু বাইরে আসেন।'

'ওরা বাচ্চু ভাইকে বাইরে নিয়ে একটা গাড়িতে তুলল। তারপর এসে বাকি সবাইকে বলল, 'জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে থানায় নিয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কিছু নাই।'

আমি ছেলেটিকে বললাম, 'দোকানে তালা দিয়ে এসেছিস?'

'হ স্যার। ক্যাশ বাক্সের টেকাও আমার কাছে।'

'কত টাকা?'

'মোট তেত্রিশ টাকা বার আনা।'

'তুই আর এত রাত্রে যাবি কোথায়? থাক এখানে।'

'দরবেশ সাবের বাসাত একটা খবর দেওন দরকার।'

'সকালে দিবি, এখন আর যাবি কীভাবে? কার্ফু না?'

ছেলেটি মাথা চুলকাতে লাগল। বললাম, 'দরবেশ সাবের বাড়িতে আছে কে?'

'তাঁর পরিবার আছে। আর একটা পুলা আছে, নান্টু মিয়া নাম। খালি কান্দে।'

'তুই খাওয়াদাওয়া করেছিস?'

'জ্বি-না।'

'ভাত খা। এখন ঘর থেকে বার হওয়া ঠিক না।'

কাদের মিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে, এই খবরে আমি বিশেষ বিচলিত বোধ করলাম না। সহজ স্বাভাবিকভাবেই চা বানালাম। রাতের জন্যে কাদের কিছু রান্না করে গেছে কিনা, তা দেখলাম হাঁড়ি-পাতিল উল্টে। ছেলেটার শোবার জায়গা দেখিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কিছু গল্পগুজবও করলাম।

'বাড়ি কোথায়?'

'জ্বি, হাজারে হাজারে আসছে। যে-সব ফুটফাট শুনেন,সব দেখবেন খতম।'

'চীনা সৈন্য আসছে, এইসব বলল কে আপনাকে?'

'হা-হা-হা। খবরাখবর কিছু কিছু পাই। ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে খানা খেয়েছি গত সপ্তাহে। খুব হামদর্দি লোক।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ইজাবুদ্দিন সাহেব।'

'জ্বি।'

'এই সব বিশ্বাস করবেন না। পাকিস্তানীদের অবস্থা খারাপ।'

'এইটা ভাইসাব আপনি কী বললেন?'

'ঠিকই বললাম। আপনি নিজেও সাবধানে থাকবেন।'

'মাবুদে এলাহী, আমি সাবধানে থাকব কেন? আমি কী করলাম?'

ইজাবুদ্দিন সাহেব কাজের লোক। বিকালবেলায় খবর আনলেন, কাদের মিয়া, পিতা বিরাম মিয়া, গ্রাম কুতুবপুর, থানা কেন্দুয়া--জীবিত আছে। দু'-এক দিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। তবে দরবেশ বাচ্চু ভাই নামে কেউ ওদের কাস্টডিতে নেই। এই নামে কোনো লোককে আটক করা হয় নি।

দু' দিনের জায়গায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল, কাদের ফিরল না। আমি রোজই এক বার যাই ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে। ভদ্রলোকের ধৈর্য সীমাহীন--একটুও বিরক্ত হন না। রোজই বলেন, 'বলছি তো ছাড়া পাবে। সবুর করেন। আল্লাহ্ দুই কিসিমের লোক পছন্দ করে, এক--যারা নেক কাজ করে, দুই--যারা সবুর করে। সবুরের মতো কিছু নাই।'

কাদেরের অনুপস্থিতিতে আমার খাওয়াদাওয়া হয় নিচতলায় নেজাম সাহেবদের ওখানে। ওদের একটি কাজের মেয়ে রান্না করে দিয়ে যেত। এখন আর আসছে না। এখন রান্না করছেন মতিনউদ্দিন সাহেব। চমৎকার রান্না। দৈনন্দিন খাবারের ব্যাপারটি যে এত সুখকর হতে পারে, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। অবশ্য নেজাম সাহেব প্রতিটি খাবারের কিছু-না-কিছু ত্রুটি বের করেন।

'গরুর গোসতে কেউ টমেটো সস দেয়! করেছেন কী আপনি? খেতে ভালো হলেই তো হয় না। একটা নিয়ম-নীতি আছে। গোসতের সঙ্গে আলু ছাড়া আর কিছু দেওয়া যায় না।'

'কেন? দেওয়া যায় না কেন?'

'আরে ভাই যায় না, যায় না! কেন তা জানি না। টেস্টের চেয়ে দরকার ফুড ভ্যালু। বুঝলেন?'

নেজাম সাহেবের আরেকটি দিক হচ্ছে, নিতান্ত আজগুবী সব কুৎসা খুব বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে বলা। এগুলি হয় সাধারণত ভাত খাবার সময়। সেদিন যেমন জলিল সাহেবের প্রসঙ্গ তুললেন, 'জলিল সাহেবের স্ত্রীর ভাবভঙ্গি লক্ষ করেছেন?'

'কী ভাবভঙ্গি?'

'না, তেমন কিছু না।'

'তেমন কিছু না হলে লক্ষ করব কীভাবে?'

'জলিল সাহেবের ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা যেন কেমন কেমন।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'কেমন কেমন মানে?'

নেজাম সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'জলিল সাহেবের ভাই বিয়ে-শাদি করেন নাই, জানেন তো?'

'না, জানি না। তাতে কী?'

নেজাম সাহেব আর কথা বললেন না। এক দিন চোখ ছোট করে বিলুর প্রসঙ্গ তুললেন, 'মেয়েটাকে দেখে কী মনে হয় আপনার, শফিক ভাই?'

'কী মনে হবে। কিছুই মনে হয় না।'

'তাই বুঝি?'

নেজাম সাহেব মাথা হেলিয়ে হে-হে করে হাসতে লাগলেন, যা শুনে গা রি রি করে। আমার অনুপস্থিতিতে এই লোকটি আমাকে নিয়ে কী বলে কে জানে?

চাঁদপুর থেকে জলিল সাহেবের ভাইয়ের একটি চিঠি এসেছে। তিনি গোটা গোটা হরফে লিখেছেন—

পরম শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই সাহেব,

সালাম পর সমাচার এই যে, আপনার পত্রখানি যথাসময়ে হস্তগত হইয়াছে। জলিল যে শেষ সময়ে আপনাদের মতো দরদী মানুষের সঙ্গে ছিল, ইহার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আমার হাজার শুকুর। সমগ্র জীবন আমি আল্লাহ্‌পাকের নিয়ামত স্বীকার করিয়াছি। গাফুরুর রাহিমের কোনো কাজের জন্য মন বেজার করি নাই। কিন্তু আজকে আমার মনটায় বড়োই কষ্ট। আপনি লিখিয়াছেন জলিলের মাথার কাছে দাঁড়ায়ে বোন নীলু ও বোন বিলু কাঁদতে ছিল। আল্লাহ্‌ তাদের বেহেস্ত নসিব করুক, হায়াত দরাজ করুক। জলিলের পরম সৌভাগ্য আপনাদের মতো মানুষের সহিত তাহার দেখা হইল। আপনি লিখিয়াছেন, তাহার মৃত্যুসংবাদ যেন এখন আর তাহার স্ত্রী ও কন্যার নিকট না দেই। আপনার কথাটি রাখিতে না পারার জন্য আমি বড়ই শরমিন্দা। হাদিসে জন্ম ও মৃত্যুসংবাদ গোপন না করার নির্দেশ আছে। আল্লাহ্‌পাক যাহাকে দুঃখ দেন, তাহাকে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাও দেন। গাফুরুর রাহিমের কাছে আপনার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ্‌পাক আপনার হায়াত দরাজ করুক, আমিন।

ইতি
আপনার স্নেহধন্য
আব্দুর রহমান

চিঠি পড়ে কেন জানি খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমি চিঠিটি হাতে নিয়ে আজিজ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। ঘরে ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে দেখি বিলু মাথা নিচু করে কাঁদছে। আজিজ সাহেব এবং নীলু গম্ভীর হয়ে বসে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই নীলু বিলু উঠে চলে গেল। আজিজ সাহেব এই প্রথম বারের মতো শব্দ শুনে আমাকে চিনতে পারলেন না, থেমে থেমে বললেন, 'কে, মতিনউদ্দিন?'

'জ্বি–না, আমি। আমি শফিক।'

'ও শফিক। বস। বস তুমি। মনটাতে খুব অশান্তি।'

আমি বেশ খানিকক্ষণ বসে রইলাম। আজিজ সাহেব কোনো কথা বললেন না। অন্য দিনের মতো বিলুকে ডেকে চায়ের ফরমাশ করলেন না। আমি যখন চলে আসবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, তখন তিনি ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'আমি আমার মেয়ে দু'টিকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কখন ঠিক করলেন?'

'অনেক দিন ধরেই চিন্তা করছিলাম। এখন মনস্থির করেছি। নেজাম সাহেবকে বলেছি আমাদের নিয়ে যেতে।'

'কবে নাগাদ যাবেন?'

'জানি না এখনো, নেজাম সাহেব অফিস থেকে ছুটি নেবেন, তারপর।'

আজিজ সাহেবেরা শুক্রবার দু'টার সময় সত্যি সত্যি চলে গেলেন।

যাবার আগে বিলু দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। খুব হাসিখুশি ঝলমলে মুখ। এসেই জিজ্ঞেস করল, 'চট করে বলুন তো, সব প্রাণীর লেজ হয়, আর মানুষের হয় না কেন? চট করে বলুন।'

আমি চুপ করে রইলাম। বিলু হাসতে হাসতে বলল, 'কি, পারলেন না তো? না, আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই নেই।'

আমি বললাম, 'তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে?'

বিলু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আর দেখাটেখা হবে না। কিছু বলবার থাকলে বলে ফেলুন। কি, আছে কিছু বলবার?'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, কিছু বলতে পরি না। নিচ থেকে নীলু তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকে, 'এত দেরি করছিস কেন, এই বিলু, এই?'

মতিনউদ্দিন সাহেব জিনিসপত্র নিয়ে উঠে আসেন দোতলায়। একা–একা নিচতলায় থাকতে ভয় লাগে তাঁর। তার উপর ক'দিন আগেই নাকি ভয়াবহ একটি স্বপ্ন দেখেছেন––একটি কালো রঙের জীপে করে তাঁকে যেন কারা নিয়ে যাচ্ছে। যারা নিয়ে যাচ্ছে, তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে বোঝা যাচ্ছে লোকগুলি অসম্ভব বুড়ো। অনেক দূর গিয়ে জীপটি থামল। তিনি জীপ থেকে নামলেন। কিন্তু

বুড়ো লোকগুলি নামল না। যে-জায়গাটিতে তিনি নেমেছেন, সেটি পাহাড়ী জায়গা, খুব বাতাস বইছে। তিন ভয় পেয়ে বললেন,'এই, তোমরা আমাকে কোথায় নামালে?'

বুড়ো লোকগুলি এই কথায় খুব মজা পেয়ে হোহো করে হাসতে লাগল। তিনি দেখলেন, জীপটি চলে যাচ্ছে। তিনি প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন, 'এই--এই।'

১০

গত চার দিন ধরে মতিন সাহেব দোতলায় আমার সঙ্গে আছেন। এই চার দিন সারাক্ষণই তিনি আমার সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে আছেন। আমি বাজারে যাচ্ছি--তিনি সঙ্গে যাচ্ছেন। আমি ইজাবুদ্দিন সাহেবের কাছে কাদেরের খোঁজে যাচ্ছি, তিনি আছেন। আজকেও বেরুবার জন্যে কাপড় পরছি, দেখি তিনিও কাপড় পরছেন।

আমি থমথমে স্বরে বললাম, 'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'আজ আমি একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না।'

মতিনউদ্দিন সাহেব অত্যন্ত অবাক হলেন, 'সে কি, আমি একা-একা থাকব কীভাবে!'

'যে-ভাবেই থাকেন থাকবেন।'

তাঁকে রেখেই আমি বের হয়ে এলাম। এই লোকটি দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠছে। এখন মনে হচ্ছে, সঙ্গে টাকাপয়সা নেই। আমার কাছে সেদিন একটি মিনোল্টা এস এল আর ক্যামেরা বিক্রি করতে চাইলেন। আমি বললাম, 'আপনার টাকাপয়সা নেই নাকি?'

'কিছু আছে। যা নিয়ে এসেছিলাম, খরচ হয়ে যাচ্ছে।'

'কাজটাজ কিছু দেখেন।'

'কী দেখব বলেন? ইউনিভার্সিটিতে কোনো পোস্ট এডভ্যার্টাইজ করছে না। মাষ্টারী ছাড়া আর কিছু তো করতেও পারব না আমি।'

'আত্মীয়স্বজন কে কে আছে আপনার?'

'আত্মীয়স্বজন কেউ নেই।'

'কেউ নেই মানে! এক জন বড়ো ভাই তো আছেন জানি। গাড়ি করে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার যার কথা ছিল।'

'ও রকিব ভাই, সে অনেক দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তাছাড়া আম্যকে সে পছন্দও করে না।,

'নীলুরাও তো শুনেছি আপনার আত্মীয়, ওদের সঙ্গে চলে গেলেন না কেন?'

মতিনউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ওরা আমাকে এখন আর পছন্দ করে না। বিলুর ধারণা আমার মাথা খারাপ। দেখেন তো অবস্থা! তবু আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নীলু খুব রাগ করল।

মতিনউদ্দিন সাহেবকে একা ঘরে রেখেই আমি চলে এলাম। সারাক্ষণ কাউকে গাদাবোটের মতো টেনে বেড়ানর কোনো অর্থ হয় না। বাইরে বেরিয়ে আবার আমার খারাপ লাগতে লাগল। সঙ্গে নিয়ে এলেই হত। রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়ালাম, ফিরে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসব? ঠিক তখনি কে যেন ডাকল,'ও ছোড ভাই, ও ছোড ভাই।'

চমকে তাকিয়ে দেখি, কাদের মিয়া। রিকশা করে আসছে। চোখ কোটরাগত, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে।

'এই কাদের, এই।'

'রিকশা ভাড়াডা দেন ছোড ভাই।'

'কখন ছাড়া পেলি?'

'এক ঘন্টার মতো হইব। বালা আছেন ছোড ভাই? আজিজ সাব আর নেজাম সাবে বালা?'

'তুই ভালো?'

'মতিনউদ্দিন সাবের শইলডা কেমন?

বলতে বলতে কাদের মিয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। সেই রিকশায় করেই কাদেরকে ঘরে নিয়ে এলাম।

'ছোড ভাই, পেটে ভুখ লাগছে, চাইরডা ভাত খাওন দরকার।'

'তুই চুপচাপ বসে থাক। আমি ভাত বসাচ্ছি। শুয়ে থাকবি?'

'জ্বি-না।'

'ঘরে ঘি আছে। গরম গরম ভাত খাবি ঘি দিয়ে। রাত্রে মতিনউদ্দিন সাহেব রান্না করবে। খুব ভালো রাঁধে।'

কাদের বসে বসে ঝিমুতে লাগল। সে কোথায় ছিল, কেমন ছিল--আমি কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না।

'ছোড ভাই, নিচতলাটা দেখলাম খালি।'

'ওরা দেশের বাড়িতে চলে গেছে।'

'বালা করছে, খুব বালা কাম করছে।'

ভাত খেতে পারল না কাদের। খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল।

'কিছুই তো মুখে দিলি না, এই কাদের।'

'শইলডা জুইত নাই ছোড ভাই।'

'শুয়ে থাক, আরাম করে শুয়ে থাক। ভয়ের কিছু নেই।'

সন্ধ্যার পর থেকে ঝড়–বৃষ্টি শুরু হল। এবং যথারীতি কারেন্ট চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখি হারিকেন জ্বালিয়ে মতিনউদ্দিন সাহেব নেজাম সাহেবের ঘর থেকে বেরুচ্ছেন। এতক্ষণ সেখানেই বসে ছিলেন। আমার তাঁর কথা মনেই হয় নি। আমাকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, 'ঝড়–বৃষ্টির রাতে মিলিটারি বের হবে না। আরাম করে ঘুমান যাবে। ঠিক না শফিক সাহেব?'

এই বলেই কাদেরের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। ভীতস্বরে বললেন, 'মরে গেছে নাকি?'

'না, মরে নি।'

'আসছে কখন?'

'বিকালে।'

'আপনি আমাকে খবর দেন নি কেন? কেন আমাকে খবর দেন নি?'

মতিন সাহেব বড়োই রেগে গেলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তাঁর চোখ–মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'আমাকে কেউ মানুষ বলে মনে করে না। যখন কাদেরকে ধরে নিয়ে গেছে, তখনো কেউ আমাকে বলে নি। আমি জেনেছি এক দিন পরে। কেন আপনারা আমার সঙ্গে এ–রকম করেন? আমি কী করেছি?'

হৈ–চৈ শুনে কাদের জেগে উঠল। মতিনউদ্দিন সাহেব হঠাৎ অত্যন্ত নরম স্বরে বললেন, 'তোমার জন্যে আমি খুব চিন্তা করেছি কাদের। হযরত শাহ্‌জালাল সাহেবের দরগাতে সিন্নি মানত করেছি।'

'আপনের শইলডা বালা?'

'আমার শরীর বেশি ভালো না কাদের। রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু তোমার পায়ে কী হয়েছে? ভেঙে ফেলেছে নাকি?'

'না, ভাঙে নাই।'

'বললেই হয়, ভাঙে নি? নিশ্চয়ই ভেঙেছে। পায়ে কোনো সেন্স আছে? চিমটি দিলে বুঝতে পার?'

'জ্বি, পারি।

মতিনউদ্দিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি রাজাকারে ভর্তি হয়ে যাও কাদের মিয়া। তাহলে মিলিটারি তোমাকে কিছু করবে না। ভয়ডর থাকবে না, আরাম করে ঘুমাতে পারবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে। নব্বই টাকা বেতন পাবে, তার সঙ্গে খোরাকি। ভালো ব্যবস্থা। ভর্তি হয়ে যাও। কালকেই যাও।'

আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম মতিন সাহেবকে। লোকটির বয়স হঠাৎ করে যেন অনেক বেড়ে গেছে। অনিদ্রার জন্যে চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। মোটাসোটা থাকায় আগে যেমন সুখী–সুখী লাগত, এখন লাগে না। কেমন

উদভ্রান্ত চোখের দৃষ্টি। সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন রুক্ষ।

মতিন সাহেব সেই রাত্রে আমাকে খুবই বিরক্ত করলেন। একটা চিঠি লিখছিলাম। তিনি পেছন থেকে বারবার সেই চিঠি পড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি রাগী গলায় বললাম, 'কী করছেন এই সব!'

'দেখছি মিলিটারির বিরুদ্ধে কিছু লিখেছেন কিনা। চিঠি এখন সেন্সার হয়। আপনার লেখার জন্যে শেষে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'আপনার ভয় নেই, মিলিটারির বিরুদ্ধে কিছু লিখছি না।'

'কী লিখেছেন, পড়ে শোনান।'

'আপনি ঘুমাতে চেষ্টা করেন মতিন সাহেব।'

'রাত্রে তো আমি ঘুমাই না। তার উপর আজকে আবার ইলেকট্রিসিটি নেই। মিলিটারির জন্যে খুব সুবিধা।'

'মতিন সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি দয়া করে আপনার ঘরে যান তো।'

'কেন, আমি থাকলে কী হয়? আমি তো আর আপনাকে বিরক্ত করছি না। বসে আছি চুপচাপ।'

বহু কষ্টে রাগ থামালাম আমি। নেজাম সাহেব কবে যে ফিরবেন, আর কবে যে এই গ্রহের হাত থেকে বাঁচব কে জানে? মতিন সাহেব হঠাৎ উঠে জানালা বন্ধ করতে লাগলেন।

'জানালা খোলা থাকলে অনেক দূর থেকে আলো দেখা যায়। এত রাত পর্যন্ত আলো জ্বলা খুব সন্দেহজনক।'

'গরমে সিদ্ধ হয়ে মরব মতিন সাহেব।'

'গরম কোথায়, হারেকেনটা নিভিয়ে দেন। দেখবেন শীত-শীত লাগবে।'

১১

গলা ব্যথার জন্যে ওষুধ কিনতে গিয়েছি, দেখি ওষুধের দোকানে রফিকের ছোট ভাই। এ্যাসপিরিন কিনছে। আমাকে দেখে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমি অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে বললাম, 'এই যে, কী ব্যাপার?'

সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। যেন আমাকে ঠিক চিনতে পারছে না। আমি হাসি-হাসি মুখে বললাম, 'তারপর, সব খবর ভালো তো? হানিমুন কোথায় করলে?'

সে তার উত্তর দিল না। এ্যাসপিরিনের দাম দিয়ে লম্বা মুখ করে বেরিয়ে গেল।

এই ছেলেটিকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। তবু রাস্তায় দেখা হলে কথা বলি। সে-ই সবজান্তার ভঙ্গিতে দু' একটা জ্ঞানগর্ভ কথা বলেই গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে এ-রকম করল কেন? ছেলেটির সঙ্গে আমার মোটামুটি খাতির আছে। আমার নিজের ধারণা, আমি বোকা সেজে থাকি বলে ছেলেটা আমাকে খানিকটা পছন্দও করে। আমি ওষুধ কিনে বাড়ি না ফিরে চলে গেলাম রফিকের ওখানে। রফিক বাসায় ছিল না। তার ছোট ভাই বেরিয়ে এসে পাথরের মতো মুখ করে বলল, 'আমাদের টেলিফোন নষ্ট।'

'টেলিফোন করতে আসি নি, রফিকের সঙ্গে কথা ছিল।'

'দাদা তো সন্ধ্যার আগে আসবে না।'

রফিক এসে পড়ল মিনিট দশেকের মধ্যেই।

'কোনো কাজে এসেছিস?'

'না, দেখা করতে আসলাম। কাদের ছাড়া পেয়েছে, জানিস নাকি?'

'জানব না কেন, তুই-ই তো টেলিফোন করলি । আছে কেমন এখন?'

'ভালোই আছে। তোদের খবর কী?'

রফিক মুখ কালো করে বলল, 'তুই জানিস না কিছু?'

'না। কী জানব?'

'সারা ঢাকার লোক জানে, আর তুই জানিস না! আয় আমার সাথে, চায়ের দোকানটাতে গিয়ে বসি। সিগারেট আছে?'

চায়ের দোকানে রফিক খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল। আমি বললাম, 'বল কী হয়েছে?'

'আমার ছোট ভাই ফিরোজ, সে এখন আর তার বৌকে দেখতে পারে না। মেয়েটা থাকে বাপের বাড়ি। সে যায় না ওখানে। খুবই অশান্তি।'

'কারণটা কী?'

'কোনোই কারণ নেই। একটা গুজব উঠেছে বুঝলি--দু'-এক জন লোক বলাবলি করছে মেয়েটাকে নাকি এক বার মিলিটারিরা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। দু' রাত নাকি রেখেছিল।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

'গুজব ছাড়া আর কিছুই না। এই সিগারেটের আগুন হাতে নিয়ে বলছি। কিন্তু ফিরোজের ধারণা, এইটা গুজব না। ঐটা তো আসলে একটা গরু, চিলে কান নিয়ে গেছে শুনলে চিলের পিছে দৌড়ায়।'

রফিক আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে নিচু গলায় বলল, 'ফিরোজকে দোষ দিয়ে কী হবে বল। আমার মায়েরও সেই রকম ধারণা। মা ঐদিন বলছিলেন-কোনো দোষ না থাকলে এই রকম একটা সুন্দরী মেয়েকে ফিরোজের কাছে বিয়ে দেয় কেন? ফিরোজের আছে কী?'

রফিক আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। আমি বললাম, 'আর চা নিস না। দুপুরবেলা গাদাখানিক চা খাওয়া–ঠিক না।'

রফিক বলল, 'কাউকে বলিস না, তোকে একটা কথা বলছি--আমি ঠিক করেছি মুক্তিবাহিনীতে চলে যাব। আমার জীবনের কোনো দাম আছে নাকি? বেঁচে থাকলেই কি আর মরলেই কি। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

'মুক্তিবাহিনীতে যাবি কীভাবে?'

'প্রথম মেঘালয়ে যাব। সেখানে গেলেই ব্যবস্থা হবে। সোর্স পাওয়া গেছে।'

'কবে যাবি?'

'দু'–এক দিনের মধ্যে যাব।'

'কাউকে বলেছিস বাড়িতে?'

'বাবাকে বলেছি।'

'চাচা কী বলেন?'

'কী বলেন, শুনে লাভ নেই। দে, আরেকটা সিগারেট দে।'

উঠে আসবার সময় রফিক ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা শফিক, আমার ভাইয়ের ব্যাপারটা একটু গোপন রাখিস। বড়ো লজ্জার ব্যাপার হয়েছে রে ভাই। সে আবার গত সোমবার নয়টা ফেনোবারবিটল খেয়েছে। চিন্তা করে দেখ।'

'কে খেয়েছে?'

'ফিরোজ, আর কে? কী লজ্জা ভেবে দেখ। স্টমাক ওয়াশটোয়াশ করাতে হয়েছে।'

ঘরে ফিরে দেখি বাচ্চু ভাই দরবেশের দোকানের সেই ছেলেটা (বাদশা মিয়া) এসে বসে আছে। কাদের বাচ্চু ভাই দরবেশের কোনো খবর পেয়েছে কিনা তাই জানতে এসেছে। কাদের গম্ভীর হয়ে বলছে, 'বাঁইচা আছে, এই খবর পাইছি।'

'কে কইছে?'

'ইজাবুদ্দিন সাব।'

'এইটা কেমুন কথা কাদের ভাই! ইজাবুদ্দিন সাব তো কইছে উল্টা কথা।'

'আমি কি তর সাথে মিছা কইছি?'

'না, তুমি মিছা কইবা ক্যান।'

'দরবেশ সাবের পরিবাররে কইস চিন্তার কোনো কারণ নাই।'

'দেখা করনের কোনো উপায় আছে কাদের ভাই?

'দেখা করনের চিন্তা বাদ দে বাদশা। বাইচা আছে--এইটাই বড়ো কথা। কয় জন বাঁচে ক দেখি?'

'তা ঠিক।'

বাদশা মিয়া ছেলেটি খুব কাজের, সে একাই বাচ্চু ভাই দরবেশের দোকান চালু করে দিয়েছে। আগের মতো বিক্রি নেই, তবু বাজার খরচ উঠে যায়। বাচ্চু

ভাইয়ের পরিবারকে পথে বসতে হয় নি।

এক দিন গেলাম তার ওখানে চা খেতে। লোকজন নেই, খালিদোকান সাজিয়ে বাদশা মিয়া বসে আছে।

'কি রে, লোকজন তো কিছু নেই।'

'সকালের দিকে কিছু কিছু হয়।'

'চা তুই একাই বানাস, না অন্য কেউ আছে?

'জ্বি-না, আমি একলাই আছি, অন্য কেউ নাই।'

কিছুতেই তাকে চায়ের দাম দেওয়া গেল না। চোখ কপালে তুলে বলল, 'আপনার কাছ থাইক্যা দাম নেই ক্যামনে? কন কী স্যার!'

আমার প্রতি তার এই প্রগাঢ় ভক্তির কারণ কী, কে জানে?

বাড়িতে ফিরে এসে দেখি আজিজ সাহেবের কাছ থেকে লম্বা একটি চিঠি এসেছে। চিঠিটি লিখে দিয়েছে নীলু। দু'টি খবর জানা গেল সে-চিঠিতে। আজিজ সাহেব তাঁর মেয়েদের জন্যে বিয়ে ঠিক করেছেন। বিলুর বিয়ে হচ্ছে যে-ছেলেটির সঙ্গে সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফিফথ ইয়ারে পড়ে। দেখতে ভালো, বংশও ভালো। ছেলের বাবা স্কুলের হেডমাষ্টার। আজিজ সাহেব লিখেছেন--বর্তমান পরিস্থিতিতে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। সমগ্র চিঠিতে নীলুর বিয়ে কোথায় হচ্ছে, কার সঙ্গে হচ্ছে, কিছুই লেখা নেই। নেজাম সাহেবের কথাও নেই। সেটিও বেশ রহস্যময়।

চিঠির সঙ্গে বিলুর একটি চিরকুটও আছে। আমি অসংখ্য বার পড়লাম সেটি।

'শফিক ভাই'

মতিন ভাইয়ের কাছে একটি চিঠি দিয়েছিলাম আপনাকে দেবার জন্যে। লিখেছিলাম এক মাসের মধ্যে অবশ্যি যেন তার জবাব দেন। আপনি দেন নি। এমন কেন আপনি?

বিলু।

মতিন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিলু কি যাবার আগে আপনাকে কোনো চিঠি দিয়েছিল?'

মতিন সাহেব অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে দিতে বলেছিল। খুব নাকি জরুরী।'

'কোথায় সে-চিঠি?'

মতিন সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আমি কী করে বলব কোথায়?'

সে চিঠিটি আর কোথাও পাওয়া গেল না।

১২

মানুষ যে-কোনো অবস্থাতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। ফাঁসির আসামীও শুনেছি এক সময় মৃত্যুভয়ে অভ্যস্ত হয়ে যায়, নিয়মিত খাওয়াদাওয়া করে, তরকারিতে লবণ কম হলে মেটকে চৌদ্দপুরুষ তুলে গালি দেয়। সেই হিসেবে আমাদের দীর্ঘ ছ' মাসে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হওয়া গেল না। তার মূল কারণ সম্ভবত অনিশ্চয়তা। রাস্তায় রিকশা নিয়ে বের হলে দু'টি সম্ভাবনা--মিলিটারিরা রিকশা থামাতে পারে, না-ও থামাতে পারে। থামলে ধরে নিয়ে যেতে পারে, না-ও ধরতে পারে। ধরে নিয়ে গেলে আবার ফিরে আসতে পারে, আবার না-ও ফিরে আসতে পারে। এই ধরনের অনিশ্চয়তায় বেঁচে থাকা যায় না।

যদি নিশ্চিতভাবে জানা যেত--এর বেশি আর কিছু হবে না, স্বাধীনতা-টাধিনতার কথা চিন্তা করে লাভ নেই, তাহলে হয়তো সময় এত দুঃসহ হত না। কিন্তু একটি আশার ব্যাপার আছে। এক দিন হয়তো আবার আগের মতো রাস্তায় ইচ্ছামতো হাঁটা যাবে। রাত বারোটায় চায়ের দোকানে বসে সিঙ্গেল চায়ের অর্ডার দেওয়া যাবে। স্বাধীনতা একেক জনের কাছে একেক রকম। এই মুহূর্তে আমার কাছে স্বাধীনতা মানে হচ্ছে, রাত এগারটায় রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে গম্ভীর হয়ে পানের পিক ফেলা। মতিনউদ্দিন সাহেবের কাছে স্বাধীনতার মানে খুব সম্ভব রাতের বেলায় জানালা খোলা রেখে (এবং বাতি জ্বালিয়ে রেখে) ঘুমানর অধিকার।

আজকাল আমি রাস্তায় দীর্ঘসময় হেঁটে বেড়াই। আগে কেউ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করত না। এখন মাঝে-মাঝে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বাসা কোথায়? কোথায় যাচ্ছি? মুসলমান না হিন্দু (হিন্দু বলতে পারে না, বলে ইন্দু)? এক বার শুধু-শুধু দু' ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখল। আমার ধারণা, নিছক ভয় দেখিয়ে মজা করবার জন্যেই। আমার সঙ্গে আরেকটি ছেলে ছিল। সে বাজার করে ফিরছে। বাজারের ব্যাগ থেকে ইলিশ মাছের লেজ বের হয়ে আছে। ছেলেটি কুলকুল করে ঘামতে শুরু করল। নেহায়েত বাচ্চা ছেলে। হয়তো কাজের ছেলেটা আসে নি, মা জোর করে পাঠিয়েছে। আমি বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। এক্ষুণি ছেড়ে দেবে।' যে সেপাইটি আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সে এক বার এসে জিজ্ঞেস করল, 'কেয়া, ডর লাগতা?'

ছেলেটি কোনো কথা বলতে পারল না। আমি বললাম, 'ইলিশ মাছ কত দিয়ে কিনেছ?'

বেচারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। প্রচণ্ড ঘামছে সে। আমি বললাম, 'এক্ষুণি ছাড়বে, ভয়ের কিছু নেই।'

'যদি না ছাড়ে?'

'কী যে বল! ছাড়বেই। তোমার নাম কী?'

লম্বামতো একটি মিলিটারি এগিয়ে এল এই সময়, এবং আমি কিছু বোঝবার আগেই প্রচণ্ড এক চড় মারল ছেলেটির গালে। আমি হাত বাড়িয়ে ছেলেটিকে টেনে তুললাম। তার ব্যাগ ছিটকে পড়েছে দূরে। সেখান থেকে আলুগুলি বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিলিটারিটি আমাদের হাত নেড়ে চলে যেতে বলল। ছেলেটির গা কাঁপছিল, ঠিকমতো হাঁটতে পারছিল না। সে ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে একটু বাসায় পৌঁছে দেবেন?' আমরা একটা রিকশা নিলাম। ছেলেটি রিকশায় উঠে ক্রমাগত চোখ মুছতে লাগল। আমার খুব ইচ্ছা হল বলি--আজ তুমি যে লজ্জা পেয়েছ, সে শুধু তোমার একার লজ্জা নয়--আমাদের সবার লজ্জা। কিন্তু কিছুই বললাম না। এই সব বড়ো বড়ো কথার আসলে তেমন কোনো অর্থ নেই।

আমি তাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ছেলেটির মা এমন ভাব করতে লাগল, যেন আমি তাকে মিলিটারির হাত থেকে ছুটিয়ে এনেছি। আমার জন্যে হালুয়া এবং পরোটা তৈরি হল। হালুয়া খাবার সময় ভদ্রমহিলা একটা তালপাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। আমি বললাম, 'রোজার সময় দেখবেন এরা বেশি ঝামেলা করবে না। আর কয়েকটা দিন।'

আমাদের কাদের মিয়াও খবর আনল, প্রথম রোজার দিন সব আটক লোকদের ছেড়ে দেয়া হবে। ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে বসবে। সব ঠিকঠাক। আমেরিকা নাকি শক্ত ধমক দিয়েছে ইয়াহিয়া খানকে। ইয়াহিয়া মিটমাটের জন্যে একটা পথ খুঁজছে।

'বুঝলেন ছোড ভাই, সাপ গিলার অবস্থা হইছে। না পারে গিলতে না পারে রাখতে।' কাদের পহেলা রমজানের জন্যে খুব উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার উৎসাহের প্রধান কারণ, দরবেশ বাচ্চু ভাই ছাড়া পাবে।

দরবেশ বাচ্চু ভাই ছাড়া পেলেন না। রমজানের সময় অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হল। আলবদর বাহিনী তৈরি হল। প্রথম বারের মতো অনুভব করলাম, কিছু কিছু যুদ্ধ সত্যি সত্যি হচ্ছে। নয়তো এতটা খারাপ অবস্থা হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইজাবুদ্দিন সাহেবও অনেকখানি মিইয়ে গেলেন। বারান্দায় এখন আর তিনি এক শ' পাওয়ারের বাতি দু'টি জ্বালান না। ছয় রোজার দিন রাতে তারাবীর নামাজ শেষে ফেরবার পথে তিনি মারা পড়লেন। হাসিমুখে খবর আনল কাদের মিয়া। প্রচণ্ড ধমক লাগালাম কাদেরকে, 'এই লোকটার জন্য বেঁচে আছিস তুই কাদের। আর যেই হাসে হাসুক, তুই হাসিস না।'

কাদেরের হাসি বন্ধ হল না। চোখ ছোট-ছোট করে বলল, 'খেইল শুরু হইছে ছোড ভাই। বিসমিল্লাহ্ দিয়া শুরু।'

মতিনউদ্দিন সাহেব শুধু বললেন, 'মানুষ মারাটা ঠিক না। মানুষ মারাটা কোনো হাসির জিনিস না কাদের মিয়া। ইজাবুদ্দিন সাহেব মানুষের অনেক উপকার করেছেন।'

দুলাভাই খবর পাঠিয়েছেন এক্ষুণি যেতে হবে। দুলাভাইয়ের গাড়ির এই ড্রাইভারটি নতুন রাখা হয়েছে। লোকটি বিহারী। মিলিটারি গাড়ি থামালেই সে গলা বের করে একগাদা কথা হড়হড় করে বলে। ফলস্বরূপ গাড়ি থেকে নামতে হয় না।

দুলাভাইয়ের বাসায় গিয়ে দেখি, জিনিসপত্র গোছগাছ হচ্ছে। আপার মুখে আষাঢ়ের ঘনঘটা। দুলাভাই বললেন, 'ইণ্ডিয়া যুদ্ধে নামবে, বুঝলে নাকি শফিক? শহর ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।'

'কখন ছাড়ছেন শহর?'

'আন্দাজ কর দেখি?'

'আজকেই যাচ্ছেন নাকি?'

'ঠিক। এক ঘন্টার মধ্যে। গাড়িতে করে যাব ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহে খবর দেয়া আছে।'

'হঠাৎ করে যাচ্ছেন দুলাভাই। আজকেই ঠিক করলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'আজকে ঠিক করার পিছনে কোনো কারণ আছে?'

'আছে। সিরিয়াস কারণ আছে।'

'বলেন শুনি।'

'তার আগে বল, তুমি একটা কাজ করতে পারবে কিনা?'

'কী কাজ?'

'লুনাকে তো চেন, শীলার বান্ধবী--এক মেজর বিয়ে করতে চায় তাকে।'

'চিনি।'

'সেই মেয়েটিকে তোমার ওখানে নিয়ে রাখবে। শুধু আজকের রাতটা। কাল ভোরে মেয়ের এক চাচা এসে মেয়েকে নিয়ে যাবে। খবর দেওয়া হয়েছে, তাঁকে তোমার ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না দুলাভাই। মেয়েটা কোথায়?'

'এইখানেই আছে। শীলার ঘরে আছে।'

ব্যাপার মোটামুটি এই রকম, গত দশ দিন ধরে লুনা এই বাড়িতে আছে। মেয়ের বাবা-মা মেজর ভদ্রলোককে বলেছেন, মেয়ে চিটাগাং তার নানার বাড়িতে আছে। ঈদের পর আসবে। বিয়ের পাকা কথাবার্তা হবে তখন। মেজর সাহেব কিছুই বলেন নি। আজ সকালে কিছু লোকজন এসে মেয়ের বাবা-মাকে তুলে নিয়ে গেছে। দুলাভাইয়ের ধারণা, তাঁকে ধরতে আসবে আজকালের মধ্যে।

বড়ো আপা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মেয়েকে আমার এখানে রাখার কথা তো আমি বলি নি, তোর দুলাভাই গলা বাড়িয়ে বলেছে। এখন দেখ না ঝামেলা।'

'ঝামেলা তো সবারই আপা। তুমি ঝামেলায় পড়লে দেখবে সাহায্যের জন্যে লোক আসছে।'

'রাখ রাখ। লম্বা লম্বা কথা ভালো লাগে না। লম্বা কথা অনেক শুনেছি।'

বড়ো আপার ঢাকা ছাড়ার ইচ্ছা মোটেই নেই। তিনি আমার সামনেই এক বার দুলাভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, সবচেয়ে ভালো হয় এই বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায়ও ওঠা।

'শফিকের ওখানে উঠতে দোষ কী? ঘর তো খালি পড়ে আছে।'

দুলাভাই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঢাকা শহরে এক ঘন্টার বেশি আমি থাকব না। ওরা আমাকে খুঁজছে।'

'তুমি তো শেখ মুজিব। তোমাকে না হলে ওদের ঘুম হচ্ছে না।'

দুলাভাই শান্ত স্বরে ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি বের করতে। আমাকে বললেন, 'লুনাকে সবকিছু বলা হয়েছে, খুব শক্ত মেয়ে। একটুও ঘাবড়ায় নি।'

আমি বললাম, 'যদি ওর চাচা না আসে?'

'আসবেই। আর যদি না-আসে, তাহলে তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে যা করবার করবে। মেয়ের এক দূরসম্পর্কের খালা আছে ঢাকায়। লুনার কাছে ঠিকানা আছে।'

'ওর বাবা-মার খবর ওকে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কান্নাকাটি করছে না?'

'আমাদের সামনে না। মেয়ে বড়ো শক্ত, মচকাবার মেয়ে না। আমি খুবই ইমপ্রেসড।'

দুলাভাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'একটা টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি, সেই টেলিফোন নাম্বারে ফোন করে বলবে যে আমি চলে গেছি।'

'কাকে বলব?'

'যে টেলিফোন রিসিভ করবে, তাকেই বলবে। বলবে মেসেজ রাখতে।'

'এইটি কি আপনার ব্রিগেডিয়ার বন্ধুর নাম্বার?'

'হ্যাঁ, তোমার ওর কাছে যাওয়ার দরকার নেই।'

১৩

লুনাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছি।

রাস্তায় নেমেই প্রচণ্ড ভয় লাগল। মনে হল রাস্তাঘাটগুলি যেন বড়ো নির্জন। যেন আজকেই ভয়ংকর একটা কিছু ঘটবে। শাহবাগের পাশে প্রকাণ্ড একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার বুক কাঁপতে লাগল। মনে হল ওরা আজ অবশ্যই আমাদের গাড়ি থামাবে। ঠাণ্ডা স্বরে বলবে, 'তোমার সঙ্গের ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে আমরা নিয়ে যাব।' আমি বলব, 'জনাব, ও

একটি নিতান্ত বাচ্চা মেয়ে। ক্লাস নাইনে পড়ে।' ওরা দাঁত বের করে হাসবে। এবং হাসতে হাসতে বলবে, 'জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে বাচ্চা মেয়েরাই ভালো।'

আমি নিজেকে সাহস দেবার জন্যেই বললাম, 'লুনা, ভয়ের কিছু নেই। তুমি শান্তভাবে চুপচাপ বসে থাক।'

'চুপচাপই তো বসে আছি।'

'জানালা দিয়ে বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছ কেন? মাথাটা নিচু করে বস না।'

'আহ্, আপনি কেন এত ভয় পাচ্ছেন? মাথা নিচু করে বসব কেন শুধু শুধু?'

ড্রাইভার গাড়ি ছোটাচ্ছে ঝড়ের মতো। এত জোরে গাড়ি চালানর দরকারটা কী? শুধু শুধু মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা। আমি বললাম, 'ড্রাইভার সাহেব, একটু আস্তে চালান।'

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ফার্স্ট গিয়ারে নিয়ে এল, যা আরো সন্দেহজনক। যেই দেখবে, তারই মনে হবে বদ মতলব নিয়ে গাড়ির ভেতর কেউ বসে আছে, সম্ভবত একটি লুকান স্টেনগান আছে, সুবিধামতো টার্গেট পেলেই বের হয়ে আসবে।

বাড়ির সামনে এসেও আমার বুকের ধকধকানি কমে না। এত খাঁ-খাঁ করছে কেন চারদিক? আগে তো কখনো এ-রকম লাগে নি। আমি গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, 'এই কাদের--কাদের।'

কাদেরের সাড়া পাওয়া গেল না। মতিনউদ্দিন সাহেব জানালা দিয়ে মাথা বের করে আবার কচ্ছপের মতো মাথা টেনে নিলেন। তার পরই ঝপাং করে জানালা বন্ধ করে ফেললেন। ভদ্রলোকের মাথা কি পুরোপুরিই খারাপ হয়ে গেছে?

'মতিন সাহেব, আপনি নিচে এসে স্যুটকেসটা নিয়ে যান দয়া করে।'

মতিন সাহেব নিচে নামলেন না। শব্দ শুনে বুঝলাম ভদ্রলোক অন্য জানালাগুলি বন্ধ করছেন।

লুনা বলল, 'আমি নিতে পারব।'

'তোমার নিতে হবে না। রাখ তুমি। মতিন সাহেব, ও মতিন সাহেব।'

কোনোই সাড়া নেই।

লুনা বলল, 'ঐ লোকটিরই কি মাথা খারাপ?'

'কে বলল তোমাকে?'

'শীলা। শীলা বলেছে।'

শীলা দেখলাম অনেক কিছুই বলেছে। এই বাড়িতে যে একটা তক্ষক আছে, তাও তার জানা। দোতলায় উঠেই বলল, 'এ বাড়িতে নাকি কুমিরের মতো বড়ো একটা তক্ষক আছে?'

'তা আছে।'

'কোথায়, দেখান তো।'

এই মেয়ে যে-অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় কেউ যে তক্ষকের খোঁজ করতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। আমি গম্ভীর মুখে লুনাকে বসিয়ে রেখে মতিন সাহেবের খোঁজ করতে গেলাম। তিনি কাদেরের ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

'দরজা খোলেন মতিন সাহেব।'

'ঐ মেয়েটা কে?'

'আমার ভাগ্নি। আপনি দরজা বন্ধ করে বসে আছেন কেন?'

মতিন সাহেব দরজা খুলে ফিসফিস করে বললেন, 'আপন ভাগ্নি?'

'তা দিয়ে দরকার কী আপনার?'

মতিন সাহেব দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বললেন, 'মেয়েটাকে আমি চিনি, শফিক সাহেব। আপনাকে আমি আগে বলি নি, এক দিন সন্ধ্যাবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা মিষ্টি গন্ধ। তাকিয়ে দেখি, মাথার কাছে একটি মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার নাকের কাছে একটা তিল। এইটি সেই মেয়ে। দেখেই চিনেছি।'

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই লোক তো বদ্ধ উন্মাদ।

মতিন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, 'আপনার বিশ্বাস হয় না?'

'না। অন্ধকারের মধ্যে আপনি একটা মেয়ের নাকের তিল দেখবেন কী করে?'

'তাও তো ঠিক।'

'মেয়েটার নাকে কোনো তিল-টিল নেই, বিপদে পড়ে এসেছে, কাল সকালে চলে যাবে।'

'কী সর্বনাশ! রাত্রে থাকবে, আগে বলেন নি কেন?'

'আগে বললে কী করতেন?'

'না, মানে করার তো কিছু নেই।'

'যান, নিচে থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে আসেন। কাদের গেছে কোথায়?'

'জানি না। আমাকে কিছু বলে যায় নি।'

'কখন আসবে, তাও বলে নি?'

'নাহ্।'

লুনা অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ সহজ হয়ে গেল। কথাবার্তা বলতে শুরু করল। ভাবখানা এ-রকম, যেন এ-জাতীয় ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত পুরুষদের মধ্যে রাত কাটানটা তেমন কিছু বড়ো ব্যাপার নয়। নিজের বাবা-মার কথা এক বারই শুধু বলল। তক্ষকরা কী খায়, সেই গল্প বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেলল, 'আপনার কি মনে হয়, আব্বা-আম্মা ছাড়া পেয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? আমার ঠিকানা তো তারা জানে না।'

প্রশ্নটি এত আচমকা এসেছে যে, আমার জবাব দিতে দেরি হল। আমি থেমে থেমে বললাম, 'খুবই সম্ভব। তবে তারা নিশ্চয়ই তোমার চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আর তোমার চাচা তো আমার ঠিকানা জানেন।'

'তা ঠিক, এটি আমার মনেই হয় নি।'

তার মুখ দেখে মনে হল বড়ো একটি সমস্যার খুব সহজ সামাধান পাওয়া গেছে। এ নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। আমি বললাম, 'তুমি হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম কর। কাদের এসে এই ঘর তোমার জন্যে ঠিকঠাক করবে। চা খাবে? খিদে লেগেছে? ঘরে অবশ্যি কিছু নেই। শুধু শুধু চা এক কাপ খাও।'

'কে বানাবে চা, আপনি?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'শীলা বলেছে আপনি কিছুই করতে পারেন না। চা পর্যন্ত বানাতে জানেন না। এই জন্যেই চাকরিটাকরি কিছুই করেন না। শুধু ঘরে বসে থাকেন।'

'আর কী বলেছে?'

'আর বলেছে আপনি কাক পোষেন। আপনি যে দিকেই যান, দশ-বারোটা কাক কা-কা করতে করতে আপনার পেছনে পেছনে যায়।'

লুনা খিলখিল করে হেসে উঠল। বহুদিন আমার এই অগোছাল নোংরা ঘরে এমন মন খুলে কেউ হেসে ওঠে নি। আমার মনে হল, সব যেন আগের মতো হয়ে গেছে। আর ভয়ে ভয়ে রাস্তায় বের হতে হবে না। রাতের বেলা জীপের শব্দ শুনে কাঠ হয়ে বিছানায় বসে থাকতে হবে না। লুনা বলল, 'আপনি আবার রাগ করলেন নাকি?'

কাদের এসে নিমেষের মধ্যে ঘরদোর গুছিয়ে ফেলল। চাল-ডালের টিন দু'টি কোথায় যেন সরিয়ে ফেলল। নতুন টেবিলক্লথ বের হল। বিছানার চাদর নিয়ে রমিজের দোকান থেকে ইস্ত্রি করিয়ে আনল। বইয়ের শেলফ গুছিয়ে, মতিন সাহেবকে নিয়ে ধরাধরি করে বড়ো ট্রাঙ্কটা সরান হল। এতে নাকি হাঁটা-চলার জায়গা বেশি হবে। এক ফাঁকে আমাকে এসে ফিসফিস করে বলে গেল, 'মেয়েছেলে না থাকলে ঘরের কোনো 'সুন্দর্য' নাই। এই কথাটা ছোড ভাই খুব খাঁটি। লাখ কথার এক কথা।'

লুনার থাকার ব্যবস্থা হল আমার ঘরে। আমি গেলাম কাদেরের ঘরে। মতিন সাহেব বললেন, তিনি বারান্দায় বসে থাকবেন। ঘরে একটি মহিলা আছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। তাঁর যখন এমনিতেই ঘুম হয় না, কাজেই অসুবিধা কিছু নেই। আমি লুনাকে বেশ কয়েক বার বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই, একটা রাত দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। আর যদি ভয়টয় লাগে, ডাকবে। আমার খুব সজাগ ঘুম।'

'না, আমার ভয় লাগছে না।'

কাদের বলল, 'চিন্তার কিছু নাই আফা। কোনো বেচাল দেখলেই আমার কাছে খবর আসব। লোক আছে আমার আফা, আগের দিন আর নাই।'

কাদের যে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছে, বেচাল দেখলেই তার কাছে খবর চলে আসবে--তা জানা ছিল না। সে কয়েক দিন আগে ঘোষণা করেছে--'এইভাবে থাকা ঠিক না। কিছু করা বিশেষ প্রয়োজন।'

মতিন সাহেবের কাছে শুনলাম কাদের নাকি কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, তারা তাকে নিয়ে যাবে। কখন নেবে, কি, তা গোপন। হঠাৎ এক দিন হয়তো চলে যেতে হবে। এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে তার কোনো কথা হয় নি। সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলার বোধহয় তার ইচ্ছাও নেই।

লুনা রাত দশটা বাজতেই ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। আমি শুতে গেলাম রাত বারটার দিকে। শোয়ামাত্রই আমার ঘুম আসে না। দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হয়। এপাশ-ওপাশ করতে হয়। দু'-তিন বার বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে পানি দিতে হয়। বিচিত্র কারণে আজ শোওয়ামাত্রই ঘুম এল। গাঢ় ঘুম। ঘুম ভাঙল অনেক রাতে। দেখি অন্ধকারে উবু হয়ে বসে কাদের বিড়ি টানছে। আমাকে দেখে হাতের আড়ালে বিড়ি লুকিয়ে ফেলে নিচু গলায় বলল, 'মেয়েডা খুব কানতেছে ছোড ভাই। মনটার মইদ্যে বড় কষ্ট লাগতাছে।'

প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই শুনতে পেলাম না। তারপর অস্পষ্ট ফোঁপানির আওয়াজ শুনলাম। মেয়েটি নিশ্চয়ই বালিশে মুখ গুঁজে কান্নার শব্দ ঢাকার চেষ্টা করছে। আমি উঠে দরজার কাছে যেতেই কান্না অনেক স্পষ্ট হল। মাঝে-মাঝে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে--'আম্মি আম্মি।' আমি কিছুই বললাম না। কিছু কিছু ব্যক্তিগত দুঃখ আছে, যা স্পর্শ করার অধিকার কারোরই নেই। মতিন সাহেব অনেকটা দূরে ইজিচেয়ারে মূর্তির মতো বসে ছিলেন, আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে ধরা গলায় বললেন, 'মেয়েটা খুব কাঁদছে। কী করা যায় বলেন তো?'

'কিছুই করার নেই।'

'তা ঠিক, কিছুই করার নেই। বড়ো কষ্ট লাগছে, আমিও কাঁদছিলাম।'

বলতে-বলতে মতিন সাহেব চোখ মুছলেন। দু' জন চুপচাপ বারান্দায় বসে রইলাম। একসময় কাদেরও এসে যোগ দিল। শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি পড়তে লাগল। জামগাছের পাতায় সড়সড় শব্দ উঠল। লুনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে ডাকল, 'আম্মি আম্মি।' পরদিন লুনার চাচা লুনাকে নিতে এলেন না।

সন্ধ্যার পর মডার্ন ফার্মেসী থেকে টেলিফোন করতে চেষ্টা করলাম। অপারেটর বলল, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নষ্ট। কখন ঠিক হবে তা জানে না। আমি বাসায় ফিরে দেখি লুনা মুখ কালো করে বসে আছে।

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকা পড়েছেন। কাল নিশ্চয়ই আসবেন।'

লুনা কোনো কথাটথা বলল না।

'কালকে আমি তোমার খালার বাসা খুঁজে বের করব। চা খেয়েই চলে যাব। তোমার কাছে ঠিকানা আছে না?'

'জ্বি–আছে।'

'আমি খুব ভোরেই যাব। যদি এর মধ্যে তোমার চাচা চলে আসেন, তাহলে তুমি তাঁর সঙ্গে চলে যাবে। অবশ্যই যাবে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না।'

লুনা শান্ত স্বরে বলল, 'না। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'আমার ফিরতে কত দেরি হবে, কে জানে। হয়তো আটকা পড়ে যাব রাস্তায়। তুমি অপেক্ষা করবে না। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায় ততই ভালো।'

রাত্রে ভাত খাওয়ার জন্যে ডাকতে গিয়ে দেখি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

'আমি ভাত খাব না।'

'তোমার কি শরীর খারাপ লুনা?'

'জ্বি–না।'

'জ্বর না তো? চোখ–মুখ কেমন যেন ফোলা–ফোলা লাগছে।'

'জ্বরটর না। কিছু খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।'

'দুধ খাবে? ঘরে কলা আছে।'

'জ্বি–না। আমি কিছুই খাব না।'

আমি ফিরে আসছি, হঠাৎ লুনা খুব শান্ত স্বরে বলল, 'আমার মনে হয় কেউ আমাকে নিতে আসবেন না।'

শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি টিকটিকি ডাকল। লুনা বলল, 'দেখলেন তো, টিকটিকি বলছে "ঠিক ঠিক"। তার মানে কেউ আসবে না।'

১৪

ঠিকানা নিয়ে যে–বাড়িতে উপস্থিত হলাম সেটি তালাবন্ধ। গেটে 'টু লেট' ঝুলছে। বাড়িওয়ালা আশেপাশেই ছিলেন, আমাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, 'বাড়ি ভাড়া করবেন? খুব সস্তায় পাবেন। সারভেন্টের জন্য আলাদা বাথরুম আছে এখানে। গত বছর দেওয়াল ডিসটেম্পার করলাম।'

বাড়িভাড়ার জন্যে আসি নি, খোরশেদ আলি সাহেবের খোঁজ করছি––শুনে ভদ্রলোক খুব হতাশ হলেন।

'এরা থাকে না এখানে––জুন মাসে বাড়ি ছেড়ে গেছে। অঞ্চলটা নাকি নিরপাদ না। বলেন দেখি কোন অঞ্চলটা নিরাপদ? আমি তো এখানেই আছি, আমার কিছু হয়েছে? বলেন দেখি?'

'খোরশেদ আলি সাহেবরা এখন থাকেন কোথায় জানেন?'

'ঠিকানা আছে। গিয়ে দেখবেন, সেইখানেও নেই। নিরাপদ জায়গা যারা খোঁজে তারা এক জায়গায় থাকে না। ঘোরাঘুরি করে।'

ভদ্রলোক ঠিকানা বের করতে এক ঘন্টা লাগালেন। শেষ পর্যন্ত ঠিকানা যেটা পাওয়া গেল, সেটায় বাড়ির নম্বর দেওয়া নেই। লেখা আছে মসজিদের সামনের হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মসজিদের সামনেই বাড়ি, তাই মনে করেছে খুব নিরাপদ। বুদ্ধি নেই, লোক তো গাছে হয় না, মায়ের পেটেই হয়।'

বহু ঝামেলা করে মসজিদের সামনের হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি খুঁজে বের করলাম। বাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের কথাই ঠিক। খোরশেদ আলি সাহেব এখানেও নেই। কোথায় গেছেন, তাও কেউ জানে না। বাসায় ফেরার পথে মনে হল, লুনার চাচা ভদ্রলোক হয়তো আমার ঠিকানাই হারিয়ে ফেলেছেন। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী কাগজটা হারিয়ে ফেলা। ঠিকানা হারিয়ে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বড়ো আপার বাসায় খোঁজাখুঁজি করছেন। অবশ্যি এ-যুক্তি তেমন জোরাল নয়। বড়ো আপার বাসায় দারোয়ান শমসের মিয়া আমার ঠিকানা খুব ভালো করে জানে। তবে এটা অসম্ভব নয় যে, শমসের মিয়াকে বিদায় দিয়ে নতুন লোক রাখা হয়েছে। খুব সম্ভব বিহারী কেউ। গাড়ির ড্রাইভার যেমন বিহারী রাখা হয়েছে সে-রকম। এ-যুক্তি যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হওয়ায় আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে বড়ো আপার বাসায় দুপুর দু'টার দিকে উপস্থিত হলাম। না, শমশের মিয়াই আছে এবং কেউ এ-বাড়িতে আসে নি। আসবার মধ্যে পিয়ন এসেছে।

'খাওয়ার কিছু আছে শমসের মিয়া?'

'ঘর তো তালা দেওয়া, ছোট ভাই। চাবি মেমসাবের কাছে।'

'তোমার কাছে কিছু নাই?'

'মুড়ি আছে।'

'দাও দেখি। তেল মরিচ দিয়ে মেখে। চিঠিপত্র কী আছে দেখি।'

'চিঠি এসেছে অনুর কাছ থেকে। বড়ো আপার কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠি (অনু আমাকে কখনো চিঠি লেখে না, নববর্ষের সময় কার্ড পাঠায়)। বড়ো আপার কাছে লেখা চিঠি আমার পড়তে কোনো দোষ নেই, এই চিন্তা করে চিঠি খুলে ফেললাম, চিঠি পড়ে বড়োই কষ্ট লাগল। এই যে, এত বড়ো একটা দুঃসময় যাচ্ছে আমাদের, সেই সম্পর্কে শুধু একটি লাইন লেখা, 'দেশের খবর শুনে খুব চিন্তা লাগছে, সাবধানে থাকবি।' তার পরপরই তিন পৃষ্ঠা জুড়ে মন্টানা যাওয়ার পথে কী ঝামেলা হয়েছিল সেটা লেখা : "আইডাহো ছাড়ার পাঁচ ঘন্টা পর গাড়ির ট্রান্সমিশন গেল বন্ধ হয়ে। হাইওয়েতে দু' ঘন্টা বসে থাকতে হল। শেষ পর্যন্ত হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ এসে রাত তিনটায় একটা অতি বাজে হোটেলে নিয়ে তুলল। পেটে প্রচণ্ড খিদে।

ভেন্ডিং মেশিনে আপেল আর মিল্ক চকোলেট ছাড়া কিছু নেই। বাধ্য হয়ে আপেল আর চকোলেট খেয়ে ঘুমাতে যেতে হল সবাইকে। আর ঘুম কি আসে? এয়ারকুলারটা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ।"

শমসের মিয়া এক গামলা মুড়ি নিয়ে এল। কাঁচামরিচ যে ক'টা ঘরে ছিল, সবই বোধ হয় দিয়ে দিয়েছে। ঝালের চোটে চোখে পানি আসার যোগাড়। শমশের মিয়া গলা নিচু করে বলল, 'জায়গায়–জায়গায় নাকি যুদ্ধ শুরু হইছে, কথাডা সত্যি ছোট ভাই?'

'সত্যি।'

'দেশ স্বাধীন হইলে গরিবদুঃখীর কোনো চিন্তা থাকত না, কী কন ছোট ভাই?'

'না থাকারই কথা।'

'খাওয়া–খাদ্য থাকব বেশুমার।'

'তা থাকবে।'

'খারাপের পরে বালা দিন আয়, এইটা বিধির বিধান।'

'খুবই খাঁটি কথা, শমসের মিয়া।'

'চিন্তা করলে মনটার মইদ্যে শান্তি হয়।'

বাড়ি ফিরে শুনি লুনার চাচা আজকেও আসেন নি। লুনার জ্বরও বেড়েছে। কাদের এক জন ডাক্তার নিয়ে এসেছিল। ওষুধপত্র দিয়েছে আর বলেছে রক্ত পরীক্ষা করতে।

লুনা আমাকে দেখে বলল, 'কাউকে পান নি?'

'কাল ঠিক পাব। সকালেই গুলিস্তান থেকে বাস নিয়ে চলে যাব নারায়ণগঞ্জ।'

'আপনি যে সারা দিন ঘোরাঘুরি করেন, আপনার ভয় লাগে না?'

'নাহ্, আমার অচল পা দেখেই মিলিটারিরা মনে করে, একে নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না।'

লুনা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনি ভাবছেন আপনার কথা শুনে আমি হাসব? আমাকে যতটা ছোট আপনি ভাবছেন, তত ছোট আমি না। আমি অনেক কিছু বুঝি।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। লুনা শান্ত স্বরে বলল, 'এই যে আমার কাল রাত থেকে জ্বর, আপনি কি আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছেন--কতটা জ্বর? আপনি কি মনে করেন, আমি জানি না কেন আপনি এ–রকম করছেন? আমি ঠিকই জানি।'

'কি জান?'

লুনা থেমে থেমে বলল, 'গায়ে হাত দিলেই আমি অন্য কিছু ভাবব, বলেন, ভাবছেন না? আমি সব বুঝতে পারি। আমি যদি কালো, কুৎসিত একটা মেয়ে

হতাম--আপনি ঠিকই আমার গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখতেন। দেখেন টিকটিকি টিকটিক করছে, তার মানে সত্যি।'

আমি লুনার কপালে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর গায়ে। স্বাভাবিক সুরে বললাম, 'লুনা তুমি শুয়ে থাক, আমি ভাত খেয়ে আসছি। আর তুমি যা বলেছ সেটা ঠিক। খুবই ঠিক।'

রান্নাঘরে ঢুকতেই মতিনউদ্দিন সাহেব বললেন, 'খতমে জালালীটা শুরু করা দরকার। লুনার চাচা আসছে না। এদিকে আবার জ্বরজ্বারি। এক লাখ পঁচিশ হাজার বার 'দোয়া ইউনুস' পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। খুব শক্ত খতম এটা।'

ভাত খেতে বসে শুনলাম দূরে কোথায় যেন গোলাগুলী হচ্ছে। থেমে থেমে বন্দুকের আওয়াজ। মতিন সাহেব মাখা ভাত রেখে উঠে পড়লেন। তাকিয়ে দেখি তাঁর পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কাদের বলল, 'ভয়ের কিছু নাই। নিশ্চিন্ত মনে ভাত খান।'

'আমার খিদে নেই। বমি বমি লাগছে।'

খানিকক্ষণ পর ভারি ভরি দু'টি ট্রাক গেল। মতিন সাহেব ভীত স্বরে বললেন, 'সব বাতিটাতি নিভিয়ে ফেলা দরকার।'

তিনি দিশাহারার মতো জানালা বন্ধ করতে ছুটলেন। কাদের বলল, 'লক্ষণ খারাপ ছোড ভাই।'

রাত দশটায় হঠাৎ বাদশা মিয়া এসে হাজির। সে খুব একটা খারাপ খবর নিয়ে এসেছে। বিহারীরা দল বেঁধে লুটপাট শুরু করেছে। মানুষও মারছে। শুরু হয়েছে তাজমহল রোড, নূরজাহান রোড অঞ্চল থেকে। খবর সত্যি হলে খুবই চিন্তার ব্যাপার। কাদেরের মুখ শুকিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'কোত্থেকে খবর পেয়েছিস?'

'ঠিক খবর স্যার। এক চুল মিথ্যা না।'

লুনার ঘরে গিয়ে দেখি সে জেগে আছে। আমাকে দেখেই বলল, 'ঐ ছেলেটি কী বলছে?'

'না, কিছু না।'

'বলেন আমাকে, কী বলছে?'

'বিহারীরা নাকি লুটপাট করা শুরু করেছে।'

'কোন জায়গায়?'

'শুরু হয়েছে মোহাম্মদপুরে।

'মোহাম্মদপুর কত দূর এখান থেকে?'

'দূর আছে।'

'আপনি ঠিক করে বলেন। কেন আমাকে লুকাচ্ছেন?

'বেশি দূর না।'

বাদশা মিয়া থাকল না। কার্ফ্যু হবে দশটা থেকে। তার আগেই দরবেশ বাচ্চু ভাইয়ের ঘরে পৌঁছান দরকার। সেখানে পুরুষমানুষ কেউ নেই। বাচ্চু ভাইয়ের ছেলের বয়স মাত্র চার বছর।

আমরা বাতিটাতি নিভিয়ে সমস্ত রাত জেগে বসে রইলাম। মাঝরাতের দিকে সোবাহানবাগের দিক থেকে খুব হৈ-চৈ ও চিৎকার শোনা গেল। এর কিছুক্ষণ পর একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় গুলীর শব্দ হতে লাগল। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম।

'কাদের, কী করা যায়?'

'আল্লাহ্‌র নাম নেন ছোড ভাই। আল্লাহ্‌ হাফেজ।'

লুনা কিছুতেই বিছানায় শুয়ে থাকতে রাজি হল না। অন্ধকার বারান্দায় আমাদের সঙ্গে সারা রাত বসে রইল। ভোর রাতে মাইকে করে বলা হল এই অঞ্চলে বিকাল তিনটা পর্যন্ত কার্ফ্যু বলবৎ থাকবে।

দিনটি মেঘলা। দুপুর থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আমি নিচতলায় আজিজ সাহেবের ঘরের সামনে চুপচাপ বসে রইলাম। আজিজ সাহেব বা নেজাম সাহেব কারোর কোনো খোঁজখবর নেই। নেজাম সাহেবের নামে একটি রেজিস্ট্রি চিঠি অনেক দিন থেকে পড়ে আছে। লোকটি কোথায় আছে কে জানে?

'ছোড ভাই, আপনের চা।'

কাদের শুধু চা নয়, একটি পিরিচে দুটি বিস্কিটও নিয়ে এসেছে।

'কী ব্যাপার, চা কেন?'

'ছোড ভাই, এই শেষ কাপ চা বানাইলাম।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

'আর দেখা হয় কি না-হয়।'

'ব্যাপার কী!'

'আমি রফিক ভাইয়ের সাথে মেঘালয় যাইতেছি ছোড ভাই।'

'কবে?'

'আইজই যাওনের কথা। কার্ফ্যু তুললেই রওনা দেওনের কথা।'

'আগে বলিস নি কেন?'

কাদের চুপ করে রইল। এক সময় মৃদু স্বরে বলল, 'কার্ফ্যু ভাঙলেই আমি লুনা আফার জন্যে ডাক্তারের ব্যবস্থা কইরা রফিক ভাইয়ের বাসায় যাইয়াম। এখন ডাক্তার পাইলে হয়।'

তাকিয়ে দেখি, কাদের শার্টের হাতায় চোখ মুছছে।

বেলা সাড়ে-তিনটায় কাদের সত্যি চলে গেল। মতিনউদ্দিন সাহেব কিছুই জানেন না বলে মনে হল। আমাকে বললেন, 'কাদেরের কাণ্ড দেখেছেন, তিন ঘন্টার জন্যে কার্ফ্যু রিলাক্স করেছে--এর মধ্যেই তাকে বেরুতে হবে। কথা বললে তো শোনে না। শেষে একার জন্যে সবাই মারা পড়ব।'

মতিনউদ্দিন সাহেব গম্ভীর হয়ে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি কেমন যেন উদভ্রান্ত। আমি বললাম, 'আপনার কি শরীর ঠিক আছে?'

'জ্বি, ঠিক আছে।'

'দেখছেন কেমন ঢালা বর্ষণ শুরু হয়েছে?'

'জ্বি দেখলাম।'

'লুনা কি ঘুমাচ্ছে?'

মতিন সাহেব হঠাৎ বললেন, 'মেয়েটার কাছে গিয়ে বসেন। ওর শরীর খুব খারাপ।' সহজ স্বাভাবিক ভালোমানুষের মতো কথাবার্তা।

লুনা জেগে ছিল। জ্বরের আঁচে তার ফর্সা গাল লালচে হয়ে আছে। চোখ দুটিও ঈষৎ রক্তবর্ণ।

'খুব বেশি খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাদের এক্ষুণি ডাক্তার পাঠাবে।'

'আপনি একটু বসবেন আমার কাছে?'

আমি তার মাথার কাছে গিয়ে বসলাম। লুনা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। আমার দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলল, 'একদিন সব আবার আগের মতো হবে, ঠিক না?'

'নিশ্চয়ই হবে, খুব বেশি দেরিও নেই।'

'সেই সময় আপানাকে আমাদের বাসায় কয়েক দিন এসে থাকতে হবে। মতিন সাহেবকে আর কাদেরকেও।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভালোই হবে।'

'তখন কিন্তু হেন-তেন অজুহাত দিতে পারবেন না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'আপনার থাকার ইচ্ছা নেই, হাসছেন মনে মনে।'

'আরে না।'

'আর যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমি প্রায়ই আপনার এখানে বেড়াতে আসব।'

'তা তো আসবেই।'

'তখন আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতে হবে। তখন যদি আপনি মনে করেন যে বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে আমি কী কথা বলব তাহলে খুব রাগ করব।'

'না, রাগ করতে দেব না।'

'আমি কিন্তু মোটেই বাচ্চা মেয়ে না। আমি অনেক কিছু জানি। ওকি, আপনি হাসছেন কেন?'

'কই, হাসছি কোথায়?'

'মনে মনে হাসছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি। যান, আপনার সঙ্গে কথা বলব না আমি।'

লুনা ঝিম মেরে গেল। দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। আমি চুপচাপ কাছে বসে রইলাম। কাদের কি ডাক্তারকে বলতে ভুলে গিয়েছে? ভোলবার কথা তো নয়।

লুনা সমস্ত দিন কিছুই খায় নি। আমি এক গ্লাস দুধ এনে দিলাম, সে তা স্পর্শও করল না। এক সময় গাঢ় রক্তবর্ণ চোখ মেলে বলল, 'কাদের এবং মতিন সাহেব এদের একটু ডেকে জিজ্ঞেস করুন তো ওরা আমাদের বাসায় থাকবে কি-না।'

'নিশ্চয়ই থাকবে।'

'তবু আপনি জিজ্ঞেস করুন।'

মতিন সাহেবকে ডেকে আনলাম। লুনা জড়িত স্বরে বলল, 'আপনি কি থাকবেন আমাদের বাসায় কিছু দিন? থাকতে হবে। না বললে শুনব না।'

মতিন সাহেব মুখ কালো করে বললেন, 'জ্বর মনে হয় খুব বেশি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, অনেক বেশি। কাদের ডাক্তার পাঠাবে।'

'কখন পাঠাবে?'

'কার্ফু ভাঙার আগেই পাঠাবে।'

লুনা বলল, 'কোনো ডাক্তার আসবে না। কেউ আসবে না আমার জন্যে।'

ডাক্তার সত্যি সত্যি এল না। সন্ধ্যার আগে আগে বাদশা মিয়া এসে উপস্থিত। জানা গেল কাদের দু' জন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, তাদের এক জন বলেছেন পরদিন সকালবেলায় আসবেন। অন্য জন বলেছেন হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আবার কার্ফু। লুনা আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। মাঝেমাঝে বেশ সহজভাবে কথা বলে পরক্ষণেই নিজের মনে বিড়বিড় করে। এক বার খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'ঠিক করে বলুন তো, আমার চেয়েও সুন্দরী কোনো মেয়ে দেখেছেন? আমাকে খুশি করবার জন্যে বললে হবে না। আমি ঠিক বুঝে ফেলব।'

আমি চুপ করে রইলাম। লুনার মুখে আচ্ছন্ন ভাব।

'চুপ করে থাকলে হবে না, বলতে হবে।'

'তোমার চেয়ে কোনো সুন্দরী মেয়ে আমি দেখি নি, লুনা।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।

'আমার গা ছুঁয়ে বলুন।'

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুনার অবস্থা খুব খারাপ হল। মনে হল লোকজন ঠিক চিনতে পারছে না। মতিন সাহেব ঘরে ঢুকতেই বলল, 'আপনি আমার আম্মিকে

একটু ডেকে দেবেন?'

মতিন সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'ডেকে দিন না। বেশিক্ষণ কথা বলব না, সত্যি বলছি।'

মতিন সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শফিক ভাই, আমি ডাক্তারের খোঁজে যাব। আপনি ওর কাছে বসে থাকুন। হাসপাতালে নিতে হবে।'

মতিন সাহেবের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সহজ সাধারণ মানুষের মতো কাপড় পরলেন। বাদশা অবাক হয়ে বলল, 'কার্ফুর মইধ্যে যাইবেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'সত্যি সত্যি বেরুচ্ছেন মতিন সাহেব?'

'হ্যাঁ। কাদের মুক্তিবাহিনীতে গেছে শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'বাদশা বলল--খুব নাকি কাঁদছিল। কাঁদার তো কিছু নেই, কী বলেন?'

মতিনউদ্দিন সাহেব জুতো পায়ে দিতে-দিতে বললেন,'দেখবেন, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমি বসে রইলাম মেয়েটির পাশে। জানালা দিয়ে দেখছি, শান্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে মতিনউদ্দিন সাহেব এগোচ্ছেন। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তাঁর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে।

এক দিন এই দুঃস্বপ্ন নিশ্চয়ই কাটবে। এই অপূর্ব রূপবতী মেয়েটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে হয়তো সত্যি সত্যি বেড়াতে আসবে এ বাড়িতে। বিলু নীলুরা ফিরে আসবে একতলায়। অকারণেই বিলু দোতলায় উঠে এসে চোখ ঘুরিয়ে বলবে, 'আচ্ছা বলুন দেখি, দুই এবং তিন যোগ করলে কখন সাত হয়?' কনিষ্কও ফিরে এসে গর্বিত ভঙ্গিতে রেলিং-এ বসে ডাকবে "কা-কা"। কাদের মিয়া বিরক্ত ভঙ্গিতে বলবে--"কী অলক্ষণ! যা-যা, ভাগ"। গভীর রাত্রে মুষলধারে বর্ষণ হবে। সেই বর্ষণ অগ্রাহ্য করে পাড়ার বখাটে ছেলেরা সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখে শিস দিতে-দিতে বাড়ি ফিরবে। বৃষ্টির ছাটে আমার তোষক ভিজে যাবে, তবু আমি আলস্য করে উঠব না।

আমি বসেই রইলাম। বসেই রইলাম। লুনা ফিসফিস করে তার মাকে এক বার ডাকল। হঠাৎ লক্ষ করলাম, মতিন সাহেব ঠিকই বলেছেন। মেয়েটির নাকের ডগায় ছোট একটি লাল রঙের তিল। বহু দূরে একসঙ্গে অনেকগুলি কুকুর ডাকতে লাগল। আমার ঘরের প্রাচীন তক্ষকটি বুক সেলফের কাছে থেকে মাথা ঘুরিয়ে গম্ভীর ভঙ্গিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।